সুখেঅসুখে

স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রকাশনা

৫ম বর্ষ জুন ২০১৪ সংখ্যা ২০

কিডনি রোগ

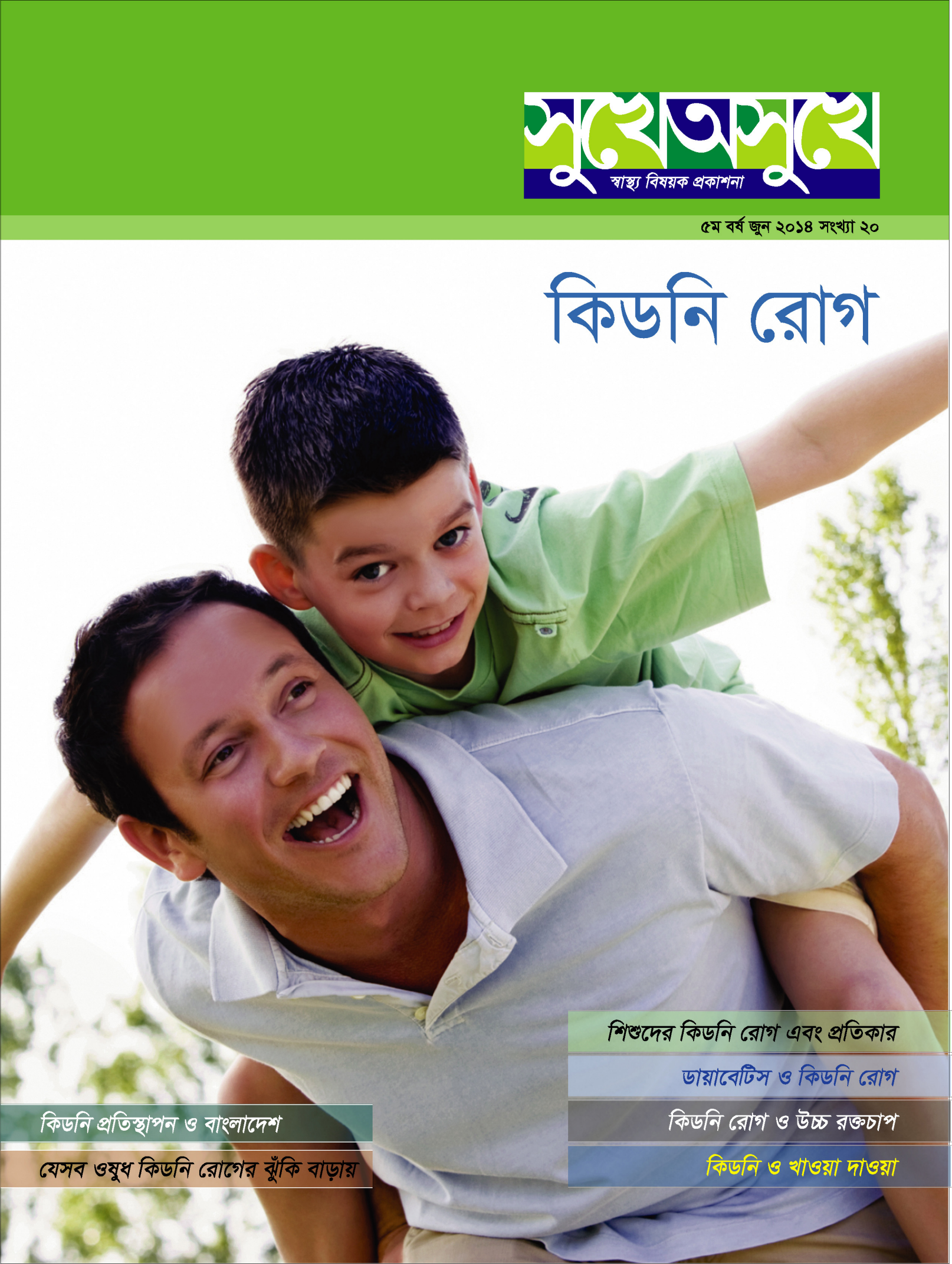

শিশুদের কিডনি রোগ এবং প্রতিকার

ডায়াবেটিস ও কিডনি রোগ

কিডনি রোগ ও উচ্চ রক্তচাপ

কিডনি ও খাওয়া দাওয়া

কিডনি প্রতিস্থাপন ও বাংলাদেশ

যেসব ওষুধ কিডনি রোগের ঝুঁকি বাড়ায়

এক্সিকিউটিভ

হেলথ চেক-আপ

বিভিন্ন রোগের প্রকোপ যেমন বাড়ছে তেমনি চিকিৎসা ক্ষেত্রে মানুষের সচেতনতাও বাড়ছে। তবে কিছু মানুষের প্রবণতা আছে রোগ দেখা দিলে বা সমস্যা তৈরি হলে তবেই চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া। কিন্তু নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করলে রোগ হওয়ার আগেই ধরা পড়ে। নিয়মিত হেলথ চেক-আপ আপনাকে অনাগত অনেক শারীরিক সমস্যা সম্পর্কে সতর্কবার্তা দেবে। রোগ নিরাময়ের চেয়ে প্রতিরোধই উত্তম। এ কথা মনে প্রাণে বিশ্বাস করতে হবে।

শরীরের সাথে মনের আছে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। শরীর ভাল তো মনও ভাল। কঠোর পরিশ্রমেও শরীরে কোনো রকমের অবসাদ আসে না। নিতান্তই সামান্য কিছু প্রতিরোধ ব্যবস্থা জটিল রোগ হতে মানুষকে রক্ষা করে। কিছু কিছু রোগের লক্ষণ প্রাথমিক অবস্থায় প্রকাশ পায় না। কিন্তু প্রাথমিক অবস্থায় সতর্ক না হলে পরবর্তীতে এসব রোগ জটিল আকার ধারণ করে। এ কারণেই স্বাস্থ্য সচেতন মানুষ নিয়মিত হেলথ চেক আপ বা স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়ে থাকেন। নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার মাধ্যমে শরীরের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ প্রত্যঙ্গের (যেমন হার্ট, লিভার, কিডনি) কার্যক্ষমতা অথবা অস্বাভাবিকতা জানা যায়। এসব কথা বিবেচনা করে ল্যাবএইড-এ বয়স, নারী ও পুরুষ ভেদে আলাদা বেশ কিছু হেলথ চেক-আপ প্যাকেজ আছে, যেমন- ল্যাবএইড হেলথ স্ক্রিনিং প্রোগ্রাম, জুনিয়র এক্সিকিউটিভ চেক-আপ, এক্সিকিউটিভ চেক-আপ, সিনিয়র এক্সিকিউটিভ চেক-আপ, পঞ্চাষোর্ধ পুরুষ চেক-আপ, মহিলা স্বাস্থ্য চেক-আপ, কম্প্রিহেনসিভ কার্ডিয়াক চেক-আপ, ডায়াবেটিক চেক-আপ প্যাকেজ। উপরন্তু প্যাকেজ হওয়াতে স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যয় তুলনামূলক অনেক কম এখন।

নিচের এক্সিকিউটিভ হেলথ চেক-আপটি করে আপনার সুস্থতা যাচাই করে নিন। প্যাকেজটিতে যে ধরনের পরীক্ষা অর্ন্তভুক্তঃ

- Complete Blood Count (CBC)
- HbA1c
- TSH
- Serum Lipid Profile (Fasting)
- Kidney Function Tests (Blood Urea, Serum Creatinine, Serum Electrolytes)
- Serum Uric Acid
- Urine for R/M/E
- Liver Function Tests (Serum Bilirubin, SGPT, Alkaline Phosphatase)
- HBsAg
- Anti HBS
- Blood Group and Rh Factor
- USG of Abdominal Organs
- ECG
- X-Ray Chest P/A View

এক্সিকিউটিভ হেলথ চেক-আপ খরচ: ৮,৫০০/-

সূচিপত্র

৫ম বর্ষ জুন, ২০১৪ সংখ্যা ২০

শিশুদের কিডনি রোগ এবং প্রতিকার ৫

যেসব ওষুধ কিডনি রোগের ঝুঁকি বাড়ায় ৬

ডায়াবেটিস ও কিডনি রোগ ৮

কিডনি রোগ ও উচ্চ রক্তচাপ ১১

কিডনির পাথর ১২

কিডনি ও শল্য চিকিৎসা ১৪

কিডনি বিকল ও ডায়ালাইসিস চিকিৎসা ১৬

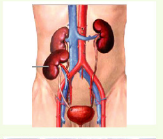
কিডনি প্রতিস্থাপন ও বাংলাদেশ ১৮

কিডনি ক্যান্সার ২০

শিশুদের জন্মগত কিডনি রোগ ২৫

কিডনির সুস্থতায় ২৭

কিডনি ও খাওয়া দাওয়া ২৯

সুখে অসুখে

সুখে অসুখে

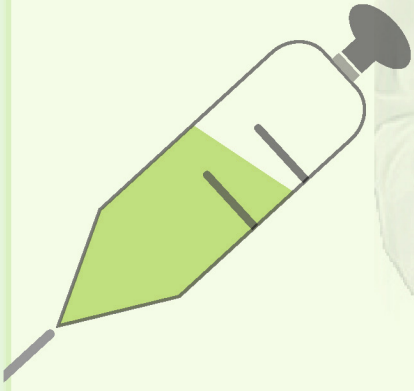

সম্পাদকীয়

আমাদের শরীরের বিভিন্ন বিপাক ক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন বিভিন্ন বিষাক্ত পদার্থ রক্ত থেকে পরিস্কার করে কিডনি। শরীরের সুস্থতা বজায় রাখতে সুস্থ কিডনির কোন বিকল্প নেই। মানুষের জীবনাচরণ, ভেজাল খাদ্য গ্রহণ, ওষুধের অপব্যবহার ইত্যাদি কারণে সারা বিশ্বে দিন দিন কিডনি রোগীর সংখ্যা বাড়ছে। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। কিডনির বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা সাধারণত দীর্ঘমেয়াদি ও ব্যয়বহুল। তবে সচেতন থাকলে কিডনির বিভিন্ন ধরনের অসুখ-বিসুখ প্রাথমিক অবস্থাতেই ধরা সম্ভব। সেক্ষেত্রে রোগের জটিলতা ও চিকিৎসার ব্যয় দুই-ই কমে আসে।

সুখে-অসুখের এবারের মূল প্রতিপাদ্য কিডনি ও এর রোগ। এবারের সংখ্যাটি সাজানো হয়েছে কিডনির বিভিন্ন রোগের কারণ, প্রতিরোধ, প্রতিকার, চিকিৎসা পদ্ধতি সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের অভিমত দিয়ে। এছাড়া এ সংক্রান্ত পাঠকের কোন প্রশ্ন থাকলে তা চিঠি বা ই-মেইল দিয়ে পাঠিয়ে দিন সম্পাদকীয় ঠিকানায়। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক সুখে-অসুখের আগামী সংখ্যায় প্রশ্নের জবাব দেবেন।

সম্পাদক
ডা. এ এম শামীম

বাড়ি ১, রোড ৪, ধানমন্ডি, ঢাকা ১২০৫ ফোন : 8610793-8, *ফ্যাক্স* : 88-02-9615497
ই-মেইল : info@labaidgroup.com, *ওয়েব* : www.labaidgroup.com

শিশুদের কিডনি রোগ এবং প্রতিকার

ডা. সৈয়দ সাইমুল হক
সহকারী অধ্যাপক
শিশু নেফ্রোলজিস্ট

বর্তমানে বাংলাদেশের জনসংখ্যা প্রায় ১৬ কোটি। এই বিশাল জনগোষ্ঠীর প্রায় অর্ধেক হলো ১৫ বছরের নীচের শিশু। এই বিশাল জনগোষ্ঠীর রয়েছে নানাবিধ সমস্যা। শিশুদের কিডনি সমস্যা তার মধ্যে অন্যতম। তথাপি সকলের ঐকান্তিক চেষ্টায় দেশ আজ ক্রমান্বয়ে সামনের দিকে এগিয়ে চলছে।

শিশুদের কিডনি রোগের লক্ষণসমূহ

- শরীর ও মুখমণ্ডল ফুলে যাওয়া
- প্রস্রাব বন্ধ কিংবা প্রস্রাব করতে অসুবিধা হওয়া
- বয়স ৫ বছর হওয়ার পরও রাতে বিছানায় প্রস্রাব করা
- অতিরিক্ত পানি পান করা ও প্রস্রাব করা
- খাদ্যের প্রতি অনিহা, বমি বমি ভাব হওয়া অথবা ঘনঘন বমি করা
- শিশুদের বয়সের তুলনায় বেড়ে না ওঠা
- ফ্যাকাসে হয়ে যাওয়া
- বার বার প্রস্রাবে সংক্রমণ হওয়া
- উচ্চ রক্তচাপ থাকা ইত্যাদি

কী কারণে কিডনি রোগ হতে পারে

- জন্মগত ত্রুটি, যেমন- যেকোন কিডনি অনুপস্থিত থাকা অথবা অকার্যকর কিডনি নিয়ে শিশুর জন্মগ্রহণ করা ইত্যাদি।
- বংশগত জটিলতা যেমন- Polycystic kidney disease, Alport syndrome ইত্যাদি।
- বিভিন্ন রোগের প্রদাহজনিত কিডনি রোগ যেমন- Acute Glomerulonephritis সাধারণত গলায় প্রদাহ অথবা খোস-পাঁচড়া অসুখ থেকে হতে পারে।
- নেফ্রোটিক সিনড্রোম-বিভিন্ন রকমের হতে পারে। তবে শিশুদের ক্ষেত্রে আনুমানিক ৮৫-৯০ভাগ অসুখ পুরোপুরি ভাল হয়ে যায় উপযুক্ত চিকিৎসার মাধ্যমে।
- বিভিন্ন জটিল অসুখ বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ক্ষতির সাথে সাথে কিডনিরও ক্ষতিসাধন করতে পারে। যেমন- SLE, Diabetes ইত্যাদি।
- তাছাড়া আগুনে পুড়ে গেলে, ডায়রিয়াজনিত পানিশূণ্যতা, অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ অথবা কোন বড় অপারেশনের পর শিশুর কিডনি ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে।

কিডনি রোগ বিশ্বের অন্যতম ঘাতক ব্যাধি। বড়দের মতো শিশুরাও এই ঘাতক ব্যাধি থেকে মুক্ত নয়। প্রাথমিক পর্যায়ে শিশুদের কিডনি রোগ নির্ণয় করা সম্ভব হলে অনেক সময়েই বড় রকমের অসুখ থেকে শিশুকে রক্ষা করা সম্ভব। তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই প্রাথমিক পর্যায়ে শিশুদের কিডনি রোগ চিকিৎসকদের অথবা বাবা-মার অগোচরেই থেকে যায়। বয়ঃবৃদ্ধির সাথে সাথে রোগের লক্ষণগুলো দেখা দিতে থাকে। তাই এই রোগ প্রতিকারই সর্বোৎকৃষ্ট উপায়।

কিডনি রোগ প্রতিকারের উপায়

- জন্মগত অসুখ অথবা ত্রুটি প্রাথমিক পর্যায়ে নির্ণয় করা সম্ভব হলে ফলাফল সন্তোষজনক হওয়া সম্ভব।
- প্রতিটি মায়ের গর্ভকালীন সময়ে অভিজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা চেকআপ এর ব্যবস্থা করা।
- ডায়রিয়া, বমি অথবা জ্বরের কারণে শিশুর শরীরে পানি এবং লবণের ঘাটতি হলে নিয়মমতো ওরস্যালাইন খাওয়ালে কিডনি বিকল হওয়া প্রতিরোধ করা সম্ভব।
- গলায় প্রদাহ, খোস-পাঁচড়াএবং ম্যালেরিয়া আক্রান্ত রোগীদের যথাসময়ে সঠিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।
- শিশুদের ওষুধ যথাযথ নিয়মে সঠিক পরিমাণে সেবন করাতে হবে। ওষুধ সেবনের কারণে প্রস্রাব কমে গেলে অথবা কিডনি রোগের লক্ষণ প্রকাশ পেলে সঙ্গে সঙ্গে ওষুধ বন্ধ করে দিতে হবে এবং ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে।
- তিন বছরের উপরের সকল অসুস্থ শিশুর রক্তচাপ পরিমাপ করা গেলে বহু কিডনি রোগ প্রাথমিক পর্যায়ে নির্ণয় করা সম্ভব।
- যেকোন বড় অপারেশন অথবা CT-Scan, MRI পরীক্ষার সময় শিশুর হাইড্রেশন এর দিকে নজর রাখা প্রয়োজন।

সর্বোপরি শিশুর জীবন বিপন্নকারী কিডনি রোগ থেকে রক্ষা করার জন্য জনসাধারণের মধ্যে বিশেষ করে পিতামাতাকে সচেতন করে তুলতে হবে। কেননা শিশুরা কিডনি রোগের জন্য একটু বেশিই ঝুঁকিপূর্ণ। দেশের শিশু স্বাস্থ্য সমস্যার প্রায় ৪.৪ শতংশই কিডনি সংক্রান্ত। তাই চিকিৎসকগণকেও শিশু কিডনি রোগ বিষয়ে সঠিকভাবে প্রশিক্ষিত করে তুলতে হবে।

যেসব ওষুধ

কিডনি রোগের ঝুঁকি বাড়ায়...

অধ্যাপক ডাঃ এম এ সামাদ
এমবিবিএস, এফসিপিএস, এমডি, এফআরসিপি
চিফ কনসালটেন্ট ও বিভাগীয় প্রধান, কিডনি রোগ বিভাগ
ল্যাবএইড স্পেশালাইজ্ড হাসপাতাল, ঢাকা।
চেয়ারম্যান, কিডনি এওয়ারনেস মনিটরিং এন্ড প্রিভেনসন সোসাইটি (ক্যাম্পস)

ডায়াবেটিস, উচ্চরক্তচাপ ও নেফ্রাইটিস এই রোগগুলো কিডনি বিকলের প্রধান কারণ হিসেবে পরিচিত। কিন্তু অনেক ধরনের ওষুধ আছে যেগুলোর কারণেও কিডনি বিকল হতে পারে। তবে একটু সচেতন হলে কিন্তু এগুলো এড়ানো যায়।

যে ওষুধগুলো কিডনির জন্য বেশি ঝুঁকিপূর্ণ

তীব্র ব্যথার ওষুধ, যেমন- ডাইক্লোফেনাক সোডিয়াম, আইবুপ্রোফেন, ইন্ডোমেথাসিন, নেপ্রোক্সেন এমনকি প্যারাসিটামলও কিডনির ক্ষতি করতে পারে। এই সকল ওষুধগুলো ঘন ঘন সেবন বা বেশি মাত্রায় ব্যবহারে কিডনি বিকলের ঝুঁকি বাড়ে।

ব্যথা হলে কী করবেন?

কিছু কিডনি বান্ধব ব্যথার ওষুধ আছে যেগুলো কিডনির ক্ষতি করে না সেগুলো প্রয়োজন মত গ্রহণ করা যাবে। এগুলো হলোঃ ট্রামাডল, সুলিনডিক এসিড, মরফিন জাতীয় ওষুধ। প্রয়োজনে প্যাথিডিন ব্যবহার করা যেতে পারে। প্যারাসিটামল তুলনামূলক কিডনির কম ক্ষতি করে। মনে রাখতে হবে যে, একক ব্যাথার ওষুধ যত না ক্ষতি করে, একই সাথে একাধিক ধরণের ব্যথার ওষুধ গ্রহণ করলে কিডনির ক্ষতি অনেক বাড়িয়ে দেয়। উদাহরণ স্বরূপ একই সাথে ডাইক্লোফেনাক ও আইবুপ্রোফেন গ্রহণের চেয়ে পূর্ণমাত্রায় যেকোন একটি যেমন ডাইক্লোফেনাক অথবা আইবুপ্রোফেন অনেক কম ক্ষতি করবে। ব্যথার ওষুধ সেবন, শিরায় ইনজেক্শনের মাধ্যমে গ্রহণ বা সাপোজিটরিজ এর মাধ্যমে পায়ু পথে গ্রহণ, যে কোন পথেই নেয়া হউক না কেন-সব ক্ষেত্রেই একই রকম ক্ষতি করে থাকে, কোন উপায়ে ওষুধ গ্রহণ করা হলো তার উপর ক্ষতি নির্ভর করে না। আরও অনেক ওষুধ অনেক উপায়ে কিডনির ক্ষতি করে। কোন কোন ওষুধের কারণে বমি বা ডায়রিয়া হয়ে পানিশূণ্যতা দেখা দেয়, ফলে আকস্মিক কিডনি বিকল হতে পারে। মাত্রাতিরিক্ত প্রশ্রাববর্ধক ওষুধ সেবনেও শরীর পানিশূণ্য হয়ে কিডনি বিকল হতে পারে। ACE/ARB জাতীয় রক্তচাপ নিয়ন্ত্রনের ওষুধগুলো- কেপ্টোপ্রিল, র‍্যামিপ্রিল, লিসিনোপ্রিল, লোসারটান, ভালসারটান, এনালাপ্রিল ইত্যাদি কিডনির জন্য সবচেয়ে ভালো হলেও অনেক সময় এগুলো আকস্মিক কিডনি বিকল ঘটাতে পারে। বিশেষ করে বয়স্কদের ক্ষেত্রে। কাজেই এই ওষুধ প্রয়োগের শুরুতে প্রতি ১৫ দিন পর পর রক্তের ক্রিয়েটিনিন বাড়ে কিনা দেখে নিতে হবে।

ক্যান্সারের অনেক ওষুধ কিডনির উপর আঘাত

অ্যান্টিবায়োটিক বা জীবাণু নাশক ওষুধ

অনেক অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধের কারণে কিডনি রোগ বিশেষ করে আকস্মিক কিডনি বিকল হতে পারে। এ ব্যপারে চিকিৎসকগণের পরামর্শ ছাড়া কখনও অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ খাওয়া ঠিক নয়। ডাক্তার ওষুধের ডোজ ও সময়কাল ঠিক করে দেবেন এবং পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার লক্ষণগুলো আমলে রেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন।

হানে। এ ব্যপারে সচেতন থাকতে হবে।
হারবাল, কবিরাজী, হোমিওপ্যাথি ও স্বপ্নে পাওয়া ওষুধে যেসব হেভিমেটাল ও অসংখ্য রাসায়নিক উপাদান থাকে সেগুলো কিডনির মারাত্মক ক্ষতি সাধন করতে পারে। এসব ওষুধ গ্রহণে অসংখ্য কিডনি বিকল রোগী আমরা দেখে থাকি। স্ব স্ব ক্ষেত্রে বিজ্ঞ চিকিৎসকদের এ ব্যপারে সতর্ক থাকতে হবে।
প্রয়োজনে তীব্র ব্যথার ওষুধও ব্যবহার করা যাবে সেক্ষেত্রে ওষুধের মাত্রা ও সময়কাল চিকিৎসকগণ নির্ধারণ করে দেবেন। ওষুধের সাথে বেশি করে পানি পান করলে কিডনির ক্ষতির সম্ভাবনা অনেকাংশে কমে যাবে।
মনে রাখবেন, বেশি মাত্রায় দীর্ঘদিন তীব্র ব্যথার ওষুধ ব্যবহারে দীর্ঘস্থায়ী কিডনি রোগের সম্ভাবনা বাড়ে।

কিডনি বিকল রোগীদের ক্ষেত্রে ওষুধের ব্যবহার

আমরা যে সকল ওষুধ ব্যবহার করি তার বেশির ভাগই কিডনির মাধ্যমে শরীর থেকে বের হয়ে যায়। কাজেই কোন কারণে কিডনির কর্মক্ষমতা কমে গেলে রক্তে দীর্ঘ সময় ওষুধ অবস্থান করে। কাজেই ওষুধের মাত্রা ও প্রয়োগের হার সমন্বয় না করে দিলে পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া অনেক বেড়ে যেতে পারে। এমতাবস্থায় কিডনি বিকলের মাত্রার উপর নির্ভর করে ওষুধের পরিমাণ ও প্রয়োগের

হার ঠিক করে দিতে হবে। এই ক্ষেত্রে কিডনির কার্যক্ষমতা পরিমাপের জন্য eGFR পরীক্ষাটি করতে হবে। eGFR পরীক্ষায় রক্তের ক্রিয়েটিনিন,রোগীর বয়স ও লিঙ্গ থেকে একটি সহজ সমীকরণের মাধ্যমে বের করা হয়। বিশেষ করে অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ এর ক্ষেত্রে ওষুধের মাত্রা ও কতবার গ্রহণ করবে তার সমন্বয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
উচ্চ রক্তচাপের কিছু ওষুধ যেমন- কেপ্টোপ্রিল, র‍্যামিপ্রিল, লিসিনোপ্রিল, লোসারটান, ভালসারটান, এনালাপ্রিল, এটেনোলল ব্যবহারের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। ব্যথার ওষুধ যেমন- ডাইক্লোফেনাক, অ্যাসপিরিন, আইবুপ্রোফেন, নেপ্রোক্সেন ইত্যাদি অসুস্থ কিডনির ক্ষমতা আরও দ্রুত নষ্ট করে দিতে পারে। এক্ষেত্রে কিডনি বান্ধব ব্যথার ওষুধ ব্যবহার করতে হবে।
ক্যান্সার চিকিৎসার অনেক ওষুধ কিডনির ক্ষতি করে। কোন কোন ওষুধ কিডনি দিয়ে বাহিত হয়। এ ওষুধগুলোর মাত্রা কমিয়ে আনতে হবে।
মনে রাখা দরকার যে, অনেক ওষুধ অতিরিক্ত মাত্রায় ও দীর্ঘ সময় ব্যবহারে সুস্থ কিডনি নষ্ট হয়ে যেতে পারে। আবার যখন কিডনির কার্যক্ষমতা কমে যায় তখন অনেক সময় ওষুধের মাত্রা ও গ্রহণের হার কমিয়ে সমন্বয় করে নিতে হয়। তাই নিজে থেকে নয়, প্রয়োজন হলে চিকিৎসকের পরমর্শ মেনে ব্যথার ওষুধ ব্যবহার করুন।

ডায়াবেটিস ও কিডনি রোগ

ডাঃ মোঃ নবীউল হাসান (রানা)
এমবিবিএস (ডিএমসি), এমডি (নেফ্রোলজি)
মেডিসিন, ডায়াবেটিস ও কিডনি রোগ বিশেষজ্ঞ
সিনিয়র কনসালটেন্ট, কিডনি রোগ বিভাগ
ল্যাবএইড স্পেশালাইজড হাসপাতাল, ঢাকা।

বাংলাদেশ সহ সারা বিশ্বে কিডনি বিকল হবার প্রধান কারণ ডায়াবেটিস। আর এ ডায়াবেটিস বর্তমানে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে মহামারির মত বেড়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশে এমন কোন পরিবার খুঁজে পাওয়া দুষ্কর যে পরিবারে ডায়াবেটিস রোগী নেই। বাংলাদেশে বিভিন্ন সংক্রামক ব্যাধি আশাতীতভাবে লোপ পাওয়ায় মানুষের গড় আয়ু অনেকাংশে বেড়েছে। কিন্তু বিভিন্ন সমীক্ষায় জানা যায়, বাংলাদেশে প্রায় দুই কোটিরও অধিক লোক কোন না কোন কিডনি রোগে আক্রান্ত। আর কিডনি রোগে আক্রান্ত হয়ে প্রতি ঘণ্টায় ৫ জন লোক অকালে মৃত্যুবরণ করছে। কিডনি অকেজো রোগীকে বাঁচিয়ে রাখতে ডায়ালাইসিসের মত ব্যয়বহুল চিকিৎসার প্রয়োজন হয়। কোন কারণে ডায়ালাইসিস বন্ধ করে দিলে কয়েক দিনের মধ্যে সে মৃত্যুবরণ করে। এমন একটি ঘাতকব্যাধির ক্ষেত্রে তাই রোগ প্রতিরোধ করাটাই হবে লক্ষ্য।

আসুন ডায়াবেটিস ছাড়া আর কি কি কারণে কিডনি অকেজো হয় তা জেনে নেই–

১. উচ্চ রক্তচাপ
২. নেফ্রাইটিস
৩. বংশগত কিডনি রোগ
৪. কিডনি পাথরের সমস্যা
৫. বারবার কিডনিতে সংক্রমণ
৬. বিভিন্ন ওষুধপত্রের বিরূপ প্রতিক্রিয়া

কি করে বুঝবেন?

মজার ব্যাপার হল শতকরা ৮০ শতাংশ কিডনি রোগী বুঝতেই পারেন না যে তাদের কিডনি অকেজো হয়েছে। যখন বুঝতে পারেন তখন তাদের দুটো কিডনিই শতকরা ৭০ ভাগই নষ্ট হয়ে যায়। তাই কিডনি রোগকে বলা হয় নিরব ঘাতক। তারপরও কিডনি রোগের লক্ষণগুলো হচ্ছে:

- পায়ে পানি আসা
- ক্ষুধা কমে যাওয়া
- বমি বমি ভাব লাগা এমন কি অনবরত বমি হওয়া
- শারীরিক দুর্বলতা ও অবসন্নতা
- শরীর ফ্যাকাশে হয়ে যাওয়া
- দিনের তুলনায় রাতে প্রস্রাব বেশি হওয়া
- শ্বাসকষ্ট হওয়া

যেহেতু শতকরা ৮০ জন রোগীর ক্ষেত্রে কিডনি অকেজোর কোন লক্ষণ দেখা যায় না, তাই তাদের কিডনি রোগ নির্ণয়ের জন্য পরীক্ষা নিরীক্ষার কোন বিকল্প নেই। স্বল্প খরচে খুব অল্প কয়েকটি পরীক্ষার মাধ্যমে প্রাথমিকভাবে কিডনি রোগ সনাক্ত করা সম্ভব। আর তা হচ্ছে প্রস্রাবের অ্যালবুমিন এবং রক্তের ক্রিয়েটিনিন পরীক্ষা।

কাদের কিডনি বিকল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি?

- যাদের ডায়াবেটিস আছে
- যারা উচ্চ রক্তচাপে ভূগছেন
- যাদের বংশে কিডনি রোগ আছে
- যাদের অতিরিক্ত ওজন
- যারা ধূমপান করেন
- যাদের কিডনি পাথরের সমস্যা আছে
- যাদের বয়স ৫০ বছরের বেশি
- অতিমাত্রায় অ্যান্টিবায়োটিক ও তীব্র ব্যথানাশক ওষুধের ব্যবহার

এদের সবারই অন্তত বছরে একবার প্রস্রাবে অ্যালবুমিন ও রক্তের ক্রিয়েটিনিন পরীক্ষা করা উচিৎ। প্রাথমিক পর্যায়ে কিডনি রোগ সনাক্ত করা গেলে আধুনিক চিকিৎসার মাধ্যমে কিছুক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে ভালো করা যায় এবং কিডনি সম্পূর্ণ বিকল হওয়া থেকে বাধা দেয়া সম্ভব। সুতরাং কিডনি বিকলের কারণ সমূহের যথাসময়ে উপযুক্ত চিকিৎসা করালে বহুলাংশে তা কমিয়ে আনা সম্ভব।

উত্তরণের উপায়

ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। রক্তে শর্করার পরিমান খালিপেটে ৬ এর নীচে এবং ভরা পেটে ৮ এর নীচে রাখা। Hb A1c ৭% এর নীচে রাখতে হবে। উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে এবং রক্তচাপ ১৩০/৮০ এর নীচে থাকবে। যেহেতু ডায়ালাইসিস এর মত চিকিৎসা অত্যন্ত ব্যয়বহুল এবং Dialysis Centre এর সংখ্যা দেশে অপ্রতুল তাই আমাদের ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমেই কিডনি সুস্থ রাখার উপর জোর দিতে হবে।

ডায়াবেটিস থেকে কিডনি রোগ

আমাদের রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা নির্দিষ্ট পরিমানের চেয়ে বেশি থাকাই ডায়াবেটিস। অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিস রোগীদের শতকরা ৪০ ভাগেরই ধীরে ধীরে একসময় কিডনি বিকল হয়ে যায়। এই কিডনি বিকল কিন্তু হঠাৎ করে হয় না। ডায়াবেটিস ধরা পড়ার ৫ থেকে ৭ বছরের মধ্যে প্রথমতঃ প্রস্রাবে অ্যালবুমিন নির্গত হতে শুরু করে। প্রথমে অল্প মাত্রায় ও পরে আরও বেশি মাত্রায় Albumin নির্গত হয়। Micro Albumin পর্যায়ে যদি ডায়াবেটিক নেফ্রোপ্যাথী ধরা পড়ে আধুনিক চিকিৎসার মাধ্যমে কিডনি অকেজো হওয়া থেকে ফিরিয়ে আনা সম্ভব। চিকিৎসা না নিলে পরবর্তীতে Creatinine সহ অন্যান্য দূষিত পদার্থগুলো রক্তে জমতে শুরু করে তাকেই আমরা 'কিডনি অকেজো' বলি যা ধীরে ধীরে এমন পর্যায়ে চলে যায় যখন শরীরের বর্জ্য পদার্থগুলো কিডনি একেবারেই বের করতে পারে না। তখন কিডনির কাজ কৃত্রিম ভাবে করানো ছাড়া রোগীকে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হয় না।

স্বাস্থ্য বিষয়ক পরামর্শে ২৪ ঘণ্টা আপনার পাশে

আপনার স্বাস্থ্য বিষয়ক পরামর্শের জন্য যে কোন মোবাইল থেকে ডায়াল করুন 10606

› প্রাথমিক স্বাস্থ্য বিষয়ক পরামর্শ › ডাক্তারের অ্যাপয়েন্টমেন্ট
› স্বাস্থ্যবিষয়ক তথ্য › অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস › হোম সার্ভিস*

* প্যাথলজির জন্য নমুনা সংগ্রহ, ব্লাড প্রেসার ও ওজন পরীক্ষা, ইসিজি

ল্যাবএইড গ্রুপ, বাড়ি ১, রোড ৪, ধানমন্ডি, ঢাকা ১২০৫
ফোন : ৮৬১০৭৯৩-৮, ৯৬৭০২১০-৩, ৮৬৩১১৭৭

ল্যাবএইড কল সেন্টার
প্রতি মুহূর্তের স্বাস্থ্য সমাধান

অ্যান্টিবায়োটিকের গল্প

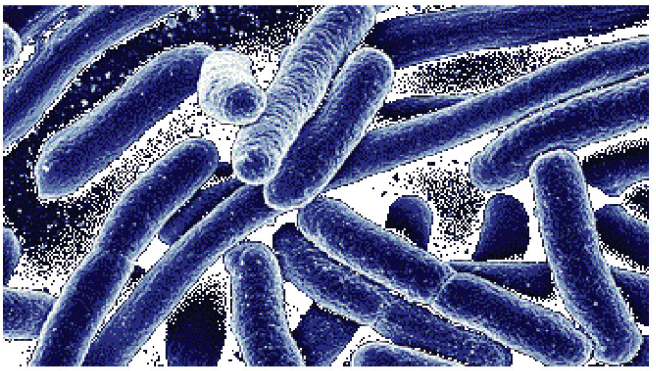

অ্যান্টিবায়োটিক হল একধরণের উপাদান যা কোন অনুজীবকে (ব্যাকটেরিয়া, প্রোটোজোয়া ও কিছু ছত্রাক) ধ্বংস করে বা তার বৃদ্ধিকে স্থির করে দেয়।

অ্যান্টিবায়োটিক কিভাবে এল

বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে বিভিন্ন Infection এর চিকিৎসা করা হত লোককাহিনীর উপর ভিত্তি করে। ২০০০ বছর আগেও প্রাচীন মিশর ও গ্রীসে কিছু নির্দিষ্ট ছত্রাক ও উদ্ভিদজাত পদার্থ দিয়ে Infection এর চিকিৎসা করা হত। অ্যান্টিবায়োটিকের ধারণা প্রথম দেন বিজ্ঞানী লুই পাস্তুর। অ্যান্টিবায়োটিক শব্দটির উদ্ভব Antibiosis থেকে যার অর্থ Against life বা জীবনের বিরুদ্ধে। Antibiosis প্রথম প্রত্যক্ষ করেন বিজ্ঞানী লুই পাস্তুর ও রবার্ট কক। তারা খেয়াল করেন এক ধরনের Airborne bacillus, *bacillus anthracis* এর বৃদ্ধিকে রোধ করতে সক্ষম। অ্যান্টিবায়োটিক এর আবিষ্কারক বলা হয় আলেকজান্ডার ফ্লেমিংকে। তিনিই প্রথম খেয়াল করেন যে পেনিসিলিয়াম ছত্রাক ব্যাকটেরিয়ার বৃদ্ধিকে রোধ করতে পারে। আলেকজান্ডার ফ্লেমিং ছিলেন একজন জীব বিজ্ঞানী। ব্যাকটেরিয়া নিয়ে কাজ করার সময় হঠাৎ একদিন লক্ষ্য করলেন যে, তিনি যেখানে ব্যাকটেরিয়ার আবাদ করছিলেন সেখানে কিছু পরিমাণ জায়গায় ব্যাকটেরিয়া জন্মাতে পারে নাই এবং তিনি সেখানে ছত্রাক জাতীয় একটি উপাদানের উপস্থিতি লক্ষ্য করলেন। তিনি বুঝতে পারলেন এই ছত্রাক জাতীয় উপাদানই সেখানে ব্যাকটেরিয়ার জন্মকে বাঁধাগ্রস্থ করেছে। এরপর তিনি ছত্রাকটি নিয়ে কাজ করা শুরু করলেন এবং আবিস্কার করলেন যে ছত্রাকটি *Penicillium notatum*. এরপর একজন রসায়নবিদের সাহায্যে তিনি এই ছত্রাক থেকে 'পেনিসিলিন' নামক অ্যান্টিবায়োটিক তৈরি করলেন। 'পেনিসিলিন' কে প্রথম অ্যান্টিবায়োটিক বলা হয়ে থাকে।

অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যবহার

- ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণ
- প্রোটোজোয়া সংক্রমণ
- ইমিউনোমড্যুলেশন
- সংক্রমণ প্রতিরোধ

ল্যাবএইড ফার্মা'র এজিথ্রোমাইসিন 'Azilab' নামে বাজারে পাওয়া যাচ্ছে। এটি প্রস্তুতে COS Grade –এর কাঁচামাল ব্যবহার করা হয়েছে।

COS grade Azithromycin
now in Bangladesh

Azilab

Azithromycin 500 mg Tablet & 200 mg/5 ml PFS

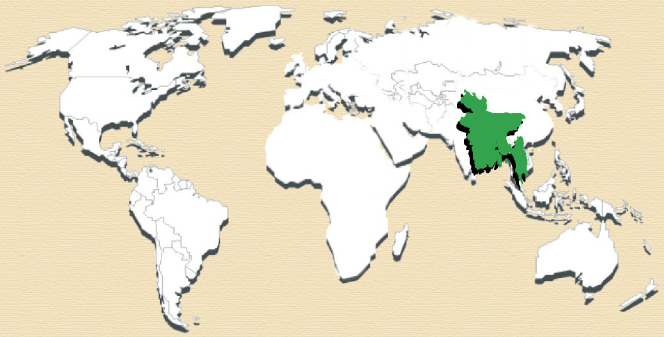

- Highest Efficacy
- Maximum Safety
- Minimum Impurity

Labaid Pharma Quality First...

কিডনি রোগ ও উচ্চ রক্তচাপ

ডা. আ প ম সোহরাবুজ্জামান
এমডি, এফসিপিএস
সিনিয়র কন্সালটেন্ট কার্ডিওলজিস্ট
পরিচালক, কার্ডিয়াক ক্যাথ ল্যাব ও হার্ট রিদম সার্ভিসেস

বাংলাদেশের জাতীয় ফুটবল দলের এক সময়ের দলনায়ক মোনেম মুন্নার কথা হয়ত বা আপনাদের মনে আছে। তিনি গত শতাব্দীর ৯০ দশকের শেষ দিকে আমার কাছে এসেছিলেন উচ্চ রক্তচাপের চিকিৎসার জন্য। তার কাছ থেকে জেনেছিলাম ফুটবল খেলার জীবনে অধিকাংশ সময় তিনি উচ্চ রক্তচাপ নিয়েই খেলেছেন। কিন্তু তিনি কোন অসুবিধা বোধ করেননি। ফুটবল থেকে অবসর নেওয়ার পরে তিনি কিছু শারীরিক অসুবিধা বোধ করছিলেন বিধায় তার পরিচিত ডাক্তার তারেক আল নাসের-এর সাথে দেখা করেন। তিনি মুন্নাকে উচ্চ রক্তচাপের চিকিৎসার জন্য আমার কাছে প্রেরণ করেন। তার শারীরিক পরীক্ষার পরে আমি ধরতে পারি তিনি রক্তশূণ্যতায় ভূগছেন। তার পায়ে পানি এসেছে, তার রক্তচাপ অনেক বেশি। তিনি দূর্বলতাবোধ করেন এবং তার ঘন ঘন প্রস্রাব হয়। আমি তাকে কিছু পরীক্ষা দেই। সেই পরীক্ষায় জানতে পারি তার দুটো কিডনি অনেক দিন ধরে বিকল হয়ে আছে। অর্থাৎ তিনি ক্রনিক কিডনি রোগে ভূগছেন। তারপরের ইতিহাস হয়ত বা আপনাদের স্মৃতিতে আছে। তার ডায়ালাইসিস শুরু করা হয় এবং পরবর্তীকালে তার কিডনি প্রতিস্থাপন করা হয়। তারপরও তিনি খুব বেশি দিন সুস্থ্য থাকেননি এবং অকালে আমরা একজন বিখ্যাত ফুটবলারকে হারাই। আমি অনুমান করি, পাঠক বুঝতে পেরেছেন উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে না রাখলে খুব দ্রুত কিডনি বিকল হয় এবং জীবন সংক্ষিপ্ত হয়ে যায়। তাই উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখা অতি জরুরি। একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের রক্তচাপ ১২০/৮০ মি.মি.মা. থাকলে আমরা স্বাভাবিক রক্তচাপ বলি। সেই রক্তচাপ ১৪০/৯০ মি.মি.মা. উপরে গেলে আমরা উচ্চ রক্তচাপ বলি। এর মধ্যবর্তী অংশে রক্তচাপ থাকলে তা নিয়ন্ত্রণের জন্য কোন ওষুধের প্রয়োজন হয় না সাধারণত। কিন্তু তার জীবনযাত্রার পরিবর্তন আনতে হয়। শারীরিক পরিশ্রম, ব্যায়াম, হাঁটা এবং খাদ্যাভাসের পরিবর্তন আনতে হয়। শারীরিক স্থূলতা থাকলে শরীরের ওজন কমিয়ে ফেলতে হয়। এসব অভ্যাস করার পরও যদি রক্তচাপ ১৪০/৯০ মি.মি.মা. উপরে চলে যায় তখন ওষুধ গ্রহণের প্রয়োজন হয়। নিয়ন্ত্রণহীন উচ্চরক্তচাপের কারণে কিডনি বিকল হয় এটাও আমরা জানতে পারলাম। এটাও জানা প্রয়োজন কিডনি রোগ থাকলেও উচ্চ রক্তচাপ হয়। তখন উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করলেই হয় না প্রাথমিক রোগেরও চিকিৎসা করতে হয়।

উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজন

- নিয়মিত শারীরিক ব্যায়াম, পরিশ্রম ও হাঁটা।
- খাদ্যে অতিরিক্ত লবণ ও লবণাক্ত খাবার পরিহার করা।
- নিয়মিত বিশ্রাম গ্রহণ ও অতিরিক্ত মানসিক চাপ পরিহার করা।
- উচ্চ রক্তচাপের সঙ্গে অন্যান্য রোগ যেমন: ডায়াবেটিস, রক্তে অতিরিক্ত কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে রাখা।
- উচ্চ রক্তচাপের পারিবারিক ইতিহাস থাকলে পূর্ণ বয়স্ক সকল সদস্যের নিয়মিত রক্তচাপ পরীক্ষা করা।
- তামাক জাতীয় দ্রব্য গ্রহণ ও ধূমপান পরিহার করা।

কিডনির পাথর

ডাঃ মুহাম্মদ হোসেন
সহকারী অধ্যাপক, ইউরোলজি বিভাগ,
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়

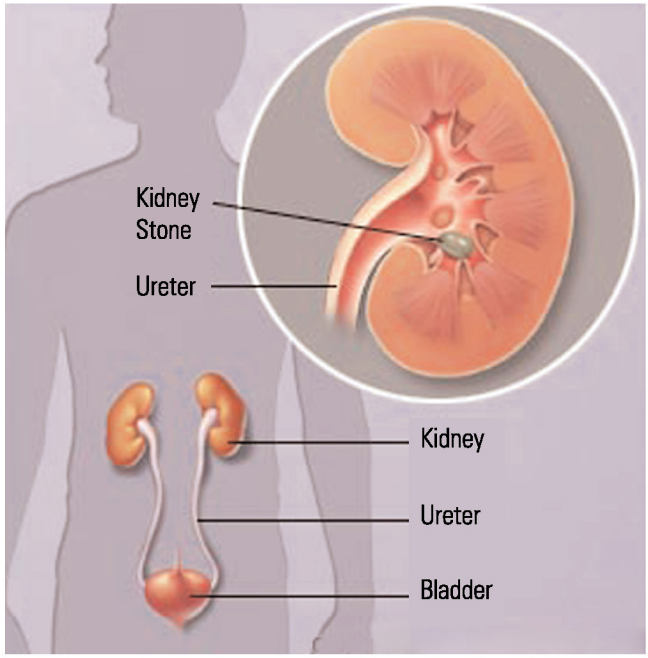

মিশরের আল হামরা সমাধি ক্ষেত্র থেকে উদ্ধারকৃত ৭০০০ বৎসরের পুরাতন মমির মূত্র থলিতে পাথর পাওয়া গেছে। এই মমিটাই এখন পর্যন্ত আবিস্কৃত সবচেয়ে পুরাতন পাথুরে রোগে আক্রান্ত মানুষ। সেই প্রাচীন মিশরে পাথুরে রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির উপর শল্য চিকিৎসা প্রয়োগের কোন পদ্ধতি জানা ছিল না বলে প্রতিয়মান হয়।

প্রাচীন ভারত বর্ষে আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে মূত্রতন্ত্রের পাথুরে রোগ সম্পর্কে জানা যায়। প্রাচীন গ্রীসের চিকিৎসা বিজ্ঞান ছিল উন্নত। হিপোক্রেটিসের বর্ণনায় কিডনি ও মূত্রতন্ত্রের পাথর ও তার চিকিৎসা পদ্ধতি পাওয়া যায়। পরবর্তীতে বিভিন্ন বিবর্তনের মধ্য দিয়ে কিডনি ও মূত্রতন্ত্রের পাথর চিকিৎসা বর্তমান আধুনিক অবস্থায় এসেছে। কিডনিতে পাথর তৈরি হওয়ার কারণগুলো জটিল, মাল্টি ফ্যাকটোরিয়াল এবং এখনও বেশ স্পষ্ট নয়। ইউরিনারি স্টোনের উপাদান হচ্ছে কৃষ্টালয়েড ও অরগানিক ম্যাট্রিক্স। সাধারণত কিডনি বা মূত্রতন্ত্রে পাথর হলে ৭৫% রোগীর ক্ষেত্রে ব্যথা নিয়ে আসতে পারে। তীব্র ব্যথা হঠাৎ করে আরম্ভ হয় এবং এই ব্যথা মেরুদন্ডের পাশে বক্ষ খাচার নীচে অনুভূত হয়। এই ব্যথা পেটের সামনের দিকেও অনুভূত হতে পারে। এই ব্যথা পাথরের অবস্থানের তারতম্যের জন্য অনুভবের স্থানেরও তারতম্য হয়। পাথর উপর বা মধ্য ইউরেটারে থাকলে ব্যাথা কিডনি বরাবর জায়গা থেকে শুরু হয়ে পেটের নিচের দিকে অনুভূত হতে থাকে বা বাকাভাবে বিস্তৃত হতে পারে। পাথর ইউরেটারের নিচের দিকে থাকলে ব্যথা অনুভূত হয় এবং এই ব্যথা পুরুষের ক্ষেত্রে টেস্টিস বা অন্ডকোষে এবং স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে ল্যাবিয়া মেজরাতে অনুভূত হয়। পাথর ইউরেটার ও ইউরিনারি ব্লাডারের অন্তবর্তী স্থানে হলে ব্যথা অনেক সময় প্রোস্টাটাইটিস, সিসটাইটিস বা ইউরেথ্রাইটিস হিসেবে ভুল হতে পারে। কিডনিতে পাথর থাকার অন্য লক্ষণ হল রক্ত বর্ণ প্রস্রাব, প্রস্রাবের সাথে এই রক্ত যাওয়া কখনো কখনো খালি চোখে দেখা নাও যেতে পারে। ঘন ঘন প্রস্রাব, জ্বর বা প্রস্রাবের জ্বালা যন্ত্রনা নিয়ে অনেকে আসতে পারেন। প্রস্রাব পরীক্ষা, এক্সরে, আল্ট্রাসনোগ্রাম পরীক্ষায় সাহায্যে এই রোগ নির্ণয় করা হয়। কিডনির পাথর চিকিৎসায় পাথরের আকার, আকৃতি ও অবস্থানের উপর নির্ভর করে শরীরের বাইরে থেকে সকওয়েভ দিয়ে ভেঙ্গে বের করে আনা যায় কিংবা অস্ত্রোপচার করে পাথর বের করা যায়। ইউরেটারে বা মূত্রথলিতে পাথরের আকার ও আকৃতির উপর নির্ভর করে প্রস্রাবের রাস্তার ভিতর দিয়ে যন্ত্রের সাহায্যে ভেঙ্গে বের করে আনা যায় বা অপারেশন করে বের করে আনা যায়। কিডনির পাথর চিকিৎসায় ব্যবহৃত উন্নতমানের প্রায় সকল চিকিৎসা পদ্ধতি বাংলাদেশ বিদ্যমান রয়েছে এবং বাংলাদেশের কৃতি ইউরোলজিস্টরা সাফল্যজনকভাবে এই সব চিকিৎসা পদ্ধতির প্রয়োগ করছেন।

ESWL (Extra corporeal shock wave lithotripsy) এমন একটা পদ্ধতি যা দ্বারা শরীরের বাহির থেকে যন্ত্রের সাহায্যে সক ওয়েভ পাঠিয়ে পাথর ভেঙ্গে ফেলা হয়। এই পদ্ধতিতে পাথর ভাঙ্গার জন্য যে বিষয়গুলো গুরুত্ব দেয়া হয় তা হলো পাথরের উপাদান, আকার, অবস্থান ও ইউরেটারের পেটেন্সি। যদি অনিয়ন্ত্রিত রক্তপাতজনিত রোগ থাকে বা গর্ভবতী মায়েদের ক্ষেত্রে ESWL ব্যবহার করা যায় না, এ ছাড়াও UTI পাথরের নীচের দিকে ইউরেটার বন্ধ, কার্ডিয়াক পেসমেকার, রেনাল ফেইলিয়র বা সিসটিন স্টোনের ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতা প্রয়োজন।

PCNL বা Percuteneous Nephrolithotomy হচ্ছে এমন একটি পদ্ধতি যার সাহায্যে Endoscopic যন্ত্রের সাহায্যে ছোট

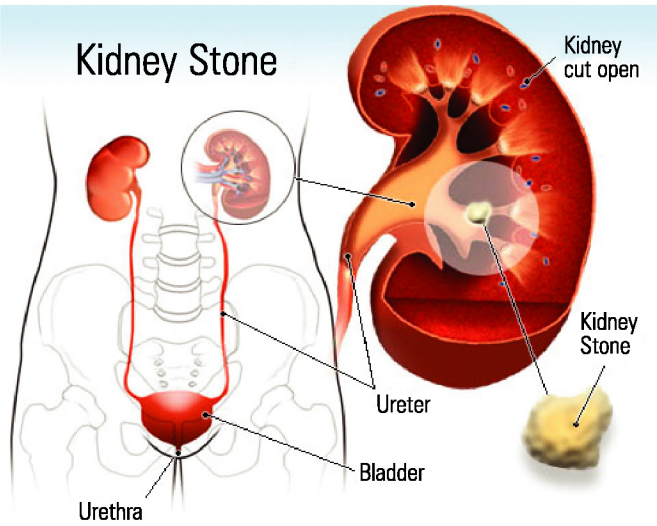

সাধারণত যে সব এলাকায় গরম বেশি সে সব জায়গায় লোকদের মধ্যে কিডনি পাথর বেশি দেখা যায়। এর কারণ হচ্ছে প্রধানত অতিরিক্ত গরমের ফলে শরীর থেকে প্রচুর পানি বের হয়ে যায়, ফলে প্রসাবের পরিমাণ কমে যায়। এর ফলে শরীর বৃত্তির কার্যকারণে পাথর হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়।

একটি ফুটো করে কিডনির পাথর ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে বের করে নিয়ে আসা হয়। বড় পাথর, সিসটিন পাথর কিংবা যাদের ESWL করা যাচ্ছে না সেসব ক্ষেত্রে এ পদ্ধতিতে রোগীর পিছনের দিক দিয়ে C-arm মেশিনের সাহায্যে কিডনিতে ফুটো করে একটি টিউব বসিয়ে দেয়া হয। এই টিউবের মধ্যে দিয়ে নেফ্রোস্কোপ মেশিন ঢুকিয়ে দেয়া হয়। এরপর মনিটরের পর্দায় পাথরটি দেখে লিথোট্রিপটর নামক অন্য একটি মেশিনের সাহায্যে পাথর ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে যন্ত্রের সাহায্যে বের করে আনা হয়।

URS বা Uretero Renoscopy হচ্ছে আরেকটি আধুনিক পদ্ধতি যার সাহায্যে মূত্রনালীর ভিতর দিয়ে ইউরেটার এবং রেনাল পেলভিস সরাসরি দেখা যায়। এই পদ্ধতিতে মেশিনের সাহায্যে ইউরেটারের পাথর বের করে আনা হয়।

প্রস্রাবের রাস্তা দিয়ে ইউরেটারে পৌছে সরাসরি মনিটরের পর্দায় ইউরেটারে পাথর দেখে তা ICPL যন্ত্রের সাহায্যে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে বের করে নিয়ে আসা হয়। এ পদ্ধতিটি মিড এবং লোয়ার ইউরেটারিক ষ্টোনের ক্ষেত্রে বেশি কার্যকর। আপার ইউরেটারিক স্টোনকে ঠেলে কিডনিতে পাঠিয়ে দিয়ে পরে ESWL করা যায়। অনেক সময় লোয়ার বা মিড ইউরেটারিক স্টোন ভাঙ্গার সময় কিডনিতে চলে যেতে পারে, সেক্ষেত্রে পরে ESWL করে নিতে হয়।

কিডনিতে একবার পাথর হলে তা বার বার হতে পারে। তাই কিছু সতর্কতা অবলম্বন করে এর পুনরাবৃত্তির হার কমিয়ে আনা যায়। সাধারণত যে সব এলাকায় গরম বেশি সে সব জায়গায় লোকদের মধ্যে কিডনি পাথর বেশি দেখা যায়। এর কারণ হচ্ছে প্রধানত অতিরিক্ত গরমের ফলে শরীর থেকে প্রচুর পানি বের হয়ে যায়, ফলে প্রস্রাবের পরিমাণ কমে যায়। এর ফলে শারীরবৃত্তিয় কার্যকারণে পাথর হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। তাই এসবক্ষেত্রে পানি বেশি খেতে হবে। পানি খাবার পরিমাণ খাদ্য গ্রহণের ৩ ঘণ্টার মধ্যে বেশি হতে হবে, যখন প্রচুর পরিশ্রম করা হয় তখনও পানি বেশি খেতে হবে। পানির পরিমাণ এমন হতে হবে যাতে ২৪ ঘণ্টার প্রস্রাবের পরিমাণ ৩ লিটার বা তার বেশি হয়।
পৌনঃপুনিকভাবে যাদের কিডনিতে পাথর হয় তাদের ক্ষেত্রে দেখা গেছে খাদ্যাভাস একটি বিরাট ভূমিকা পালন করে। প্রোটিন, কিডনি দিয়ে ক্যালসিয়াম, অক্সালেট ও ইউরিক এসিডের নিঃসরণ বাড়ায়। এই এসিড কিডনি থেকে ক্যালসিয়াম শোষণ কমায়। এসব বিপাক ক্রিয়ার ফলে কিডনিতে পাথরের সম্ভবানা বেড়ে যায়। যাদের কিডনিতে বার বার পাথর হয় তাদেরকে দৈনিক প্রোটিন গ্রহণ বেশি না করা শ্রেয়।

ডায়েটারি ফাইবারে ফাইটিক এসিড থাকে যা অন্ত্রের ক্যালসিয়ামের সাথে যুক্ত হয়ে ক্যালসিয়ামের শোষণ কমিয়ে দেয়। ফাইবার যুক্ত খাদ্য যেমন গম, সয়া, চাউলের ভূসি স্টোন রিকারেন্স কমায়। যেসব খাদ্যে ক্যালসিয়াম ও অক্সালেট বেশি আছে যেমন দুধ, পনির ইত্যাদি রিকারেন্ট স্টোনের রোগীদের কম খাওয়া উচিৎ। অধিক লবণযুক্ত খাদ্য কিডনিতে পাথরের ঝুঁকি বাড়ায় তাই যাদের কিডনিতে বার বার পাথর হয় তাদের অধিক লবণযুক্ত খাদ্য কম খাওয়া ভাল। এছাড়াও যাদের কিডনিতে বার বার পাথর হয় তাদেরকে পাথর এনালাইসিস করে স্পেসিফিক সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

কিডনি ও শল্য চিকিৎসা

ডা. জাহাঙ্গীর কবির
এফআরসিএস, এফসিপিএস, এমবিবিএস
ইউরোলজিস্ট ও এন্ড্রোলজিস্ট

শরীরের অন্যান্য অঙ্গপ্রতঙ্গের মত কিডনি ও মূত্রতন্ত্র বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে, কোনো কোনো সময় অস্ত্রোপচারের প্রয়োজনও হয়। তবে অস্ত্রোপচারের আগে রোগীর বয়স, স্বাস্থ্য, অন্যান্য রোগের উপস্থিতি ইত্যাদি বিবেচনায় আনা দরকার। অনেক সময় অপারেশন না করেও রোগীকে সুস্থ রাখা যায়। তবে এ পরিস্থিতিতে একজন ইউরোলজিস্ট সিদ্ধান্ত নিতে পারেন কখন এবং কি অপারেশন করা দরকার। নিচে স্বল্পপরিসরে পর্যায়ক্রমে সমস্যাগুলো আলোচনা করা হলো।

পাথুরে রোগ

মূত্রতন্ত্রের পাথর সাধারণত কিডনি, ইউরেটার, মূত্রথলি ও মূত্রনালীতে হয়ে থাকে। প্রস্রাবের সাথে বের হওয়া বিভিন্ন খনিজ পদার্থ, যেগুলো সাধারণত প্রস্রাবের সঙ্গে বের হয়ে যায় সেগুলো জমাট বেঁধে এই পাথরগুলো তৈরি হয়। কিডনি ও ইউরেটারে পাথর হলে পিঠ ও পেটের ব্যথা এবং মূত্রথলিতে পাথর হলে তলপেটে ব্যথা হয়। এছাড়া প্রস্রাবের সাথে রক্ত বা পাথর কনা বের হতে পারে, জ্বরও হতে পারে। পাথরের অবস্থান ও আকৃতিভেদে বিভিন্ন ধরণের চিকিৎসার ব্যবস্থা রয়েছে। কিডনি ও ইউরিনারি পাথর চিকিৎসায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বড় ধরণের কাটা ছেড়া করা হয় না। প্রযুক্তির অগ্রগতির সাথে সাথে এখন কাটাছেড়া করা ছাড়াই বিভিন্নভাবে কিডনি পাথরের চিকিৎসা সম্ভব। সংক্ষেপে কয়েকটি বহুল প্রচলিত চিকিৎসা পদ্ধতি সম্পর্কে জেনে নিন।

ESWL (Extra Corporeal Shock Wave Lithotripsy) একটি পরীক্ষিত প্রচলিত পদ্ধতি যাতে সকওয়েভ ব্যবহৃত হয়। শক্তিশালী সকওয়েভ শরীরের বাহির থেকে মেশিনের সাহায্যে পাঠানো হয় যা পাথরে আঘাত করে পাথরকে ছোট ছোট টুকরা করে দেয়। পরবর্তীতে টুকরোগুলো প্রস্রাবের সাথে বের হয়ে যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে পাথর ভাঙ্গার পূর্বে কিডনি থেকে মূত্রথলিতে কৃত্রিম নল (Stent) স্থাপন করার প্রয়োজন হয়। লিথোট্রিপসি টেবিলে C-Arm সম্বলিত X-ray এর সাহায্যে পাথর চিহ্নিত করা হয় এবং প্রয়োজনীয় মাত্রার সকওয়েভ প্রদান করা হয়।

PCNL (Percutaneous Nephrolithotomy) যখন পাথরের অবস্থানের কারণে ESWL ব্যবহার যুক্তিযুক্ত না হয় কিংবা পাথরের আকার বড় হয় তখন PCNL পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। এই পদ্ধতিতে ছোট একটি ছিদ্র করে কিডনি বরাবর একটি পথ তৈরি করা হয়। ঐ পথে Nephroscope নামে একটি যন্ত্রের মাধ্যমে পাথরের অবস্থান জেনে তা দূর করা হয়। রোগীকে হাসপাতালে অল্প কয়েক দিন থাকতে হয়।

URS and ICPL এই পদ্ধতিতে প্রস্রাবের রাস্তা দিয়ে বাহির থেকে শলাকার ন্যায় যন্ত্র (ureteroscope) দিয়ে মূত্রপথ, মূত্রথলি, মূত্রনালী হয়ে কিডনী পর্যন্ত যে কোনো স্থান ভিডিও মনিটরে দৃষ্টি গোচর করা যায়। এরপর খুবই সরু শলাকা সম্বলিত নিউম্যাটিক লিথট্রিপটর নামক যন্ত্র দিয়ে পাথরে আঘাত করে পাথর গুড়ো করা হয়, বড় বড় টুকরোগুলো খুবই ছোট একটি ফরসেপ অথবা বাস্কেট দিয়ে বের করে আনা হয়। এ কাজে এখন নিউম্যাটিক লিথট্রিপটর এর জায়গায় অনেক সময় লেজার ব্যবহার হচ্ছে।

কিডনি ও মূত্রথলির টিউমার ঃ পিঠ বা পেটের একপাশে ব্যথা, তলপেটে ব্যথা, প্রস্রাবের সাথে রক্ত যাওয়া এই রোগের প্রধান লক্ষণ। প্রস্রাবের সাথে রক্ত বের হওয়া উপসর্গটি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে নেয়া উচিত এবং অনতিবিলম্বে চিকিৎসকের পরামর্শ নেয়া উচিত। বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষা করে টিউমারের আকার ও অবস্থান নির্ণয় করা হয়। মূত্র পরীক্ষা, আল্ট্রাসাউন্ড, IVU, CT, MRI এর মত পরীক্ষা দ্বারা কিডনি, মূত্রনালী অথবা মূত্রথলির টিউমার এর আকার, অবস্থান, ব্যাপ্তি নির্ণয় করা যায়। সময় মতো রোগ ধরা পড়লে অপারেশন, কেমোথেরাপী ও রেডিওথেরাপীর মাধ্যমে সুস্থতালাভ করা যায়।

প্রোস্টেট গ্রন্থির বৃদ্ধি ঃ পুরুষদের মূত্রথলি থেকে প্রস্রাব নির্গমনের পথের চারদিক ঘিরেই প্রোস্টেট গ্রন্থির অবস্থান। এটি বীর্যরস সরবরাহ করে। বৃদ্ধ বয়সে এই প্রোস্টেট গ্রন্থি বৃদ্ধি পেয়ে প্রস্রাব নির্গমনে বাঁধা প্রদান করে রোগের সৃষ্টি করে। এই রোগের লক্ষণগুলো হলো-ঘন ঘন প্রস্রাব, রাতে ঘুম ভেঙ্গে প্রস্রাব করতে উঠা, সরুনলে থেমে থেমে প্রস্রাব হওয়া, প্রস্রাব পূর্ণভাবে ক্লিয়ার না হওয়া ইত্যাদি। পরীক্ষা নিরীক্ষা করে চিকিৎসা পদ্ধতি নিধারন করা হয়। বিগত দুই দশকে লেজার রশ্মির বিভিন্ন ব্যবহার এর মাধ্যমে প্রোস্টেট গ্রন্থি বৃদ্ধির চিকিৎসা করা হচ্ছে। এছাড়াও রয়েছে মাইক্রোওয়েভ হাইপারথার্মিয়া, হাই-ইনটেনসিটি ফোকাস্ড আল্ট্রাসাউন্ড ইত্যাদি নানা রকম চিকিৎসা।

প্রোস্টেট গ্রন্থিতে ক্যান্সার ঃ সঠিক পরিসংখ্যান না থাকলেও আমাদের দেশে প্রোস্টেট ক্যান্সারের প্রাদুর্ভাব যথেষ্ট বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। প্রোস্টেট ক্যান্সারের চিকিৎসা BPH থেকে একেবারেই ভিন্ন। প্রোস্টেট ক্যান্সারের অপারেশন ও অপারেশনের সিদ্ধান্ত বা অন্যান্য চিকিৎসা নির্ভর করে অনেক কিছুর উপর। টিস্যু পরীক্ষা করে প্রোস্টেট ক্যান্সার ও এর গ্রেড নির্ণয় করা হয়। তারপর CT স্ক্যান, MRI এবং Bone Scan জাতীয় পরীক্ষা দ্বারা প্রোস্টেট ক্যান্সার এর স্টেজ নির্ণয় করা হয়। প্রোস্টেট ক্যান্সার যা গ্রন্থির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে এবং যাদের বয়স অপেক্ষাকৃত কম, অর্থাৎ যাদের ১০ বৎসর এর বেশি বেঁচে থাকার সম্ভাবনা আছে, তাদের অপারেশন অথবা রেডিওথেরাপি দ্বারা ক্যান্সার নির্মূল করা সম্ভব।

মূত্রনালীর স্ট্রিকচার ঃ গনোরিয়া জাতীয় ইনফেকশনের কারণে বা সরাসরি আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে এই রোগ হয়। মূত্রনালী সরু হয়ে মূত্রপ্রবাহে বাধা সৃষ্টি করে। সরুনলে ধীরগতিতে প্রস্রাব হয়। প্রস্রাব শেষে মূত্রথলিতে প্রস্রাব জমে থাকে। সময় মতো চিকিৎসা না করলে জমে থাকা প্রস্রাব ইউরেটার এমনকি কিডনিতে চাপ দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত করে। শরীরের অন্য জায়গা, বিশেষ করে মুখগহ্বরের ভিতর থেকে অল্প পরিমান চামড়া এনে মূত্রনালীতে প্রতিস্থাপন করতে হয়। এটি বেশ একটি কার্যকারী পদ্ধতি (Substitution Urethroplasty) তবে অনেক সময় মূত্রনালীর সরু অংশ কেটে বাদ দিয়ে ভালো অংশ জোড়া দেয়া হয় (Anastomotic urethroplasty)

জন্মগত বিকলাঙ্গতা ঃ শরীরের অন্য অংশের মতো মূত্র ও জননতন্ত্রের বিকলাঙ্গতা নিয়ে অনেক শিশু ভূমিষ্ঠ হতে পারে। স্বাভাবিক অবস্থানের নিচে বা উপরে মূত্রদ্বারের অবস্থান (Hypospadias/ Epispadias), পেটের বাইরে মূত্রথলির অবস্থান (Bladder exstrophy), অন্ডকোষের বিরূপ অবস্থান জাতীয়

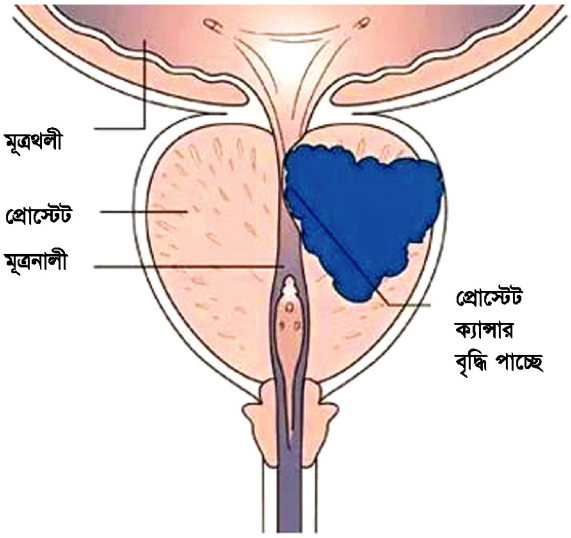

অসুবিধাগুলি জন্মের সাথে সাথেই ধরা পড়ে। অন্য অসুবিধাগুলি যেমন মূত্রনালীতে ভালভ, কিডনি ইউরেটারের সংকোচিত সংযোগ, ইউরেটার মূত্রথলির সংকোচিত সংযোগ, মূত্রথলি হতে প্রস্রাব উল্টো পথে ইউরেটারে প্রবাহ ইত্যাদি রোগ সমূহ উপসর্গ তৈরি করার পরেই ধরা পড়ে। পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর উপযুক্ত অস্ত্রপচার করে রোগের চিকিৎসা করা যায়।

পুরুষদের যৌন ও প্রজনন অক্ষমতা (বন্ধাত্ব) ঃ যৌন অক্ষমতার প্রধান কারণগুলো হলো মানসিক, স্নায়বিক ও রক্তসঞ্চালনের অসুবিধা। সঠিক এবং বিজ্ঞান সম্মত যৌনজ্ঞানের অভাবই যৌন অক্ষমতার কারণ। অতিরিক্ত মদ্য ও ধূমপান, ডায়াবেটিস, জননেন্দ্রিয়ের রক্তনালীর অসুবিধা অথবা অজ্ঞাত কারণের জন্যও যৌন অক্ষমতা দেখা দেয়। পরীক্ষার মাধ্যমে অক্ষমতার কারণ নির্ণয় করে ওষুধ সেবন করলে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই রোগী সক্ষম হয়ে উঠে। কোন কিছুই কাজ না হলে অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে চিকিৎসা করা হয় (Penile Prosthesis)।
পুরুষ বন্ধ্যাকরণ অপারেশনে প্রজনন ক্ষমতা হারানো ব্যক্তিও অপারেশনের মাধ্যমে পুনরায় প্রজনন ক্ষমতা ফিরে পেতে পারে (Vas recanalisation)। এ ছাড়া সরাসরি সুক্ষ সূচ দিয়ে অন্ডকোষ থেকে শুক্রানু সংগ্রহ করা যায়। যা কিনা পরে টেষ্টটিউব বেবি গঠন প্রক্রিয়ায় কাজে লাগানো হয়।

অন্ডকোষ পাক খাওয়া ঃ জন্মগত ভাবে ত্রুটি থাকলে বা শীতের সময় শিশু থেকে শুরু করে যুবক বয়স পর্যন্ত যেকোনো সময়ে অন্ডকোষ পাক খেতে পারে। অন্ডকোষ পাক খেলে প্রচণ্ড ব্যথা শুরু হয় সাথে অন্ডকোষ ফুলে যেতে পারে। পাক খাওয়ার কারণে অন্ডকোষে রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে অন্ডকোষ দ্রুত নষ্ট হতে পারে। পরীক্ষা করে সময় নষ্ট না করে, এ ধরণের রোগীদের দ্রুত ৫/৬ ঘন্টার মধ্যেই অস্ত্রোপচার করে অন্ডকোষ এর পাক ঘুরিয়ে দুদিকের অন্ডকোষই কয়েক জায়গায় বেঁধে দিতে হয়। যাতে ভবিষ্যতে আর পাক খেতে না পারে। অস্ত্রোপচার এ দেরী হলে অন্ডকোষ নষ্ট হয়ে যায়। অন্ডকোষ তখন কেটে ফেলতে হয়। তাই শিশুদের অন্ডকোষে ব্যথা হলে দ্রুত হাসপাতাল নেয়া দরকার এবং একজন দক্ষ চিকিৎসক এর পরামর্শ নেয়া দরকার।

কিডনি বিকল ও ডায়ালাইসিস চিকিৎসা

অধ্যাপক ডা. আছিয়া খানম
এমবিবিএস, এমডি (নেফ্রোলজি)
কিডনি রোগ বিশেষজ্ঞ

ডায়ালাইসিস কী?

যখন কিডনির কার্যকারীতা ক্রমান্বয়ে লোপ পেতে থাকে এবং কিডনি ৮০-৯০ শতাংশ কর্মক্ষমতা হারায় ও শরীরের অতিরিক্ত পানি ও বর্জ্য পদার্থ কিডনির মাধ্যমে শরীর থেকে বের করতে পারে না তখন জীবন বাঁচানোর জন্য ডায়ালাইসিস এর মাধ্যমে চিকিৎসা করা হয়। কিডনি সংযোজন ব্যতিত ডায়ালাইসিসই একমাত্র চিকিৎসা যা একজন কিডনি রোগীর জীবন বাঁচাতে পারে।

কিভাবে ডায়ালাইসিস সম্পূর্ণ কিডনি বিকল রোগীর জীবন বাঁচায়

এ পদ্ধতিতে রক্ত পরিশোধিত করে রক্তের দূষিত বর্জ্য যেমন, ইউরিয়া, ক্রিয়েটিনিন এবং শরীরের অতিরিক্ত পানি বের করে দেয়, রক্তের লবণের তারতম্য রক্ষা করে (সোডিয়াম, পটাশিয়াম বাইকার্বনেট ইত্যাদি)। কিন্তু তারপরও কখনো কখনো একটি স্বাভাবিক কিডনির কার্যকারিতা ডায়ালাইসিস এর মাধ্যমে সম্ভব হয় না। ডায়ালাইসিস রোগীদের হিমোগ্লোবিনের মাত্রা ঠিক রাখার জন্য প্রয়োজনীয় ওষুধ দিতে হয়।

কখন একজন কিডনি রোগীর ডায়ালাইসিস এর প্রয়োজন হয়?

যখন কিডনির কার্যকারিতা ৮০-৯০% কমে যায় (End stage kidney failure) তখন কিডনি ওষুধের মাধ্যমে শরীরের অতিরিক্ত পানি ও দূষিত পদার্থ বের করতে না পারার কারণে রোগীর ক্ষুধামন্দা, বমি বমি ভাব হওয়া, অবষণ্নতা, শরীর ফুলে যাওয়া, শ্বাসকষ্ট, শরীরে লবণের তারতম্য হওয়ার কারণে বিভিন্ন উপসর্গ তৈরি হয় এবং রোগীর জীবন বিপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। এ সময় 'ডায়ালাইসিস' জীবন বাঁচানোর অন্যতম উপায় হিসাবে বিবেচিত হয়।

ধীরগতির কিডনি বিকল ডায়ালাইসিসের মাধ্যমে নিরাময় করা সম্ভব না। তবে তাৎক্ষণিক কিডনি বিকল বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অল্প কিছুদিনের ডায়ালাইসিস এর মাধ্যমে সম্পূর্ণ নিরাময় সম্ভব।

সাধারণত দুই ধরনের ডায়ালাইসিস করা হয়

১। হেমোডায়ালাইসিস (HD)
২। পেরিটোনিয়াল ডায়ালাইসিস (PD)

হেমোডায়ালাইসিস খুবই প্রচলিত একটি ডায়ালাইসিস পদ্ধতি যাতে একটি নকল কিডনি (Artificial Kidney) ও মেশিনের সাহায্যে শরীরের অতিরিক্ত পানি ও দূষিত বর্জ্য শরীর থেকে বের করা হয়। এ পদ্ধতিতে সপ্তাহে সাধারণত ২-৩ বার ৪ ঘণ্টা করে ডায়ালাইসিস করা হয়।

পেরিটোনিয়াল ডায়ালাইসিস একটি অত্যন্ত কার্যকর ডায়ালাইসিস পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে একটি নরম নল পেটের মধ্যে ঢুকিয়ে বিষেশভাবে তৈরি এক ধরনের স্যালাইনের মাধ্যমে রক্তকে পরিশোধিত করা হয়, এ পদ্ধতিতে কোন মেশিনের প্রয়োজন হয় না।

কিভাবে হেমোডায়ালাইসিস করা হয়

সম্পূর্ণরূপে খারাপ হওয়া কিডনি রোগীদের বাঁচিয়ে রাখার জন্য এটা বহুল প্রচলিত একটি পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে কিডনি রোগীদের কৃত্রিম কিডনির সাহায্যে মেশিনের মাধ্যমে রক্ত বিশুদ্ধ করা হয়।

এ পদ্ধতিতে কৃত্রিম কিডনির মাধ্যমে মেশিনের সাহায্যে প্রতি মিনিটে ২৫০-৩০০সিসি রক্ত পাম্প করা হয়। এ সময় রক্ত যাতে জমাট না বাঁধে তার জন্য হেপারিন নামে একটি ওষুধ ব্যবহার করা হয়। কৃত্রিম কিডনি যা ডায়ালাইজার নামে পরিচিত, এক ধরণের স্যালাইনের (ডায়ালাইজেট) সাহায্যে রক্তকে পরিশোধিত করে, পরিশোধিত রক্ত পুনরায় মেশিনের সাহায্যে শরীরে প্রবেশ করানো হয়, হেমোডায়ালাইসিস সাধারণত সপ্তাহে ২-৩ বার এবং প্রতিবার ৪ ঘণ্টা করে করা হয়। এখানে প্রশ্ন হতে পারে কিভাবে শরীরের রক্ত মেশিনে ঢুকিয়ে আবার পরিশোধিত রক্ত শরীরে ঢুকানো হয়? এ জন্য শরীরে ভাসকুলার এক্সেস করে নিতে হয়। সাময়িকভাবে ডায়ালাইসিস এর জন্য ডানদিকের বুকের শিরা (Rt Subclavian Vein), ডানদিকের গলার শিরা (Rt Jugular Vein) অথবা যে কোন দিকের উরুর শিরা (Femoral Vein) তে ক্যাথেটার ঢুকিয়ে ডায়ালাইসিস করা হয়। এ পদ্ধতিতে বেশিদিন ডায়ালাইসিস সম্ভব হয় না ইনফেকশনের কারনে, তাই দীর্ঘস্থায়ী পদ্ধতি হিসাবে বাম হাতের কনুই বরাবর বা কবজি বরাবর শিরা ও ধমনিকে সংযোগ করে একটি পথ তৈরি করা হয় যাকে A-V ফিষ্টুলা (A-V Fistula) বলা হয়। কোন কারণে বাম হাত Fistula করার জন্য অনুপযোগী হলে ডান হাতেও করা হয়।

হেমোডায়ালাইসিস কোথায় করা হয়

হেমোডায়ালাইসিস সাধারণত হাসপাতাল বা ডায়ালাইসিস সেন্টারে ডাক্তারদের তত্ত্বাবধানে বিশেষভাবে ট্রেনিং প্রাপ্ত নার্সদের সহযোগিতায় করা হয়। বাংলাদেশে বর্তমান ৫০ টির বেশি হেমোডায়ালাইসিস সেন্টার আছে, তবে খুব অল্প সংখ্যক রোগী বাড়িতে ডায়ালাইসিস মেশিন রেখে ডায়ালাইসিস করে থাকে, এ ক্ষেত্রে পরিবারের সদস্যদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ও সহযোগিতা প্রয়োজন। অনেকে মনে করে হেমোডায়ালাইসিস যন্ত্রণাদায়ক কিনা। না, শুধুমাত্র ডায়ালাইসিস শুরুর সময় রক্ত টানার জন্য যে সূঁচ ফুটানো হয় সেটুকুর সামান্য ব্যথা রোগী অনুভব করে, ডায়ালাইসিসের ৪ ঘণ্টা সময় রোগী বিশ্রাম নিয়ে, ঘুমিয়ে, গান শুনে বা টিভি দেখে পার করতে পারে। ডায়ালাইসিস চলাকালীন সময়ে রোগীদের হালকা খাবার ও পানীয় পান করতে বলা হয়। হেমোডায়ালাইসিস একটি বহুল প্রচলিত পদ্ধতি হলেও এর সুবিধা ও অসুবিধা দুই'ই রয়েছে।

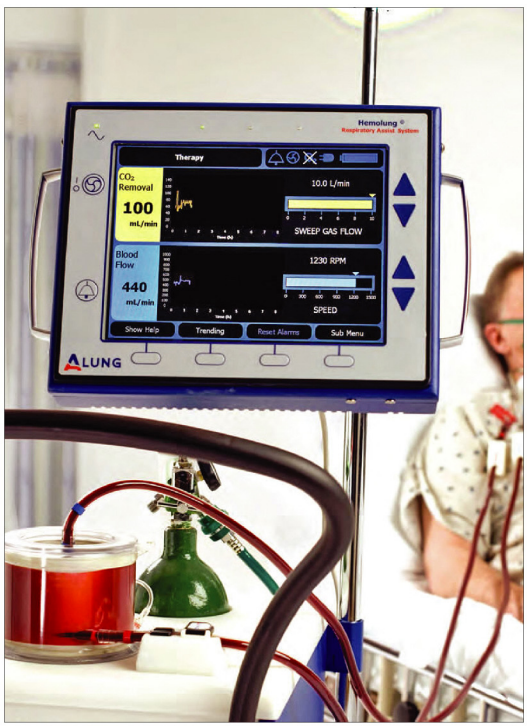

হেমোডায়ালাইসিস এর সুবিধা সমূহ

- হেমোডায়ালাইসিস সাধারণত বিশেষভাবে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত নার্স দ্বারা করানো হয় বলে রোগীর জন্য আরামদায়ক হয়
- এ পদ্ধতিতে শরীরের অতিরিক্ত পানি ও দূষিত বর্জ্য তাড়াতাড়ি বের করা সম্ভব
- সপ্তাহে ৩ দিন ডায়ালাইসিস করার কারণে বাকি দিনগুলো রোগীরা মুক্তভাবে চলতে পারে
- ইনফেকশন হওয়ার সম্ভবনা কম
- পেরিটোনিয়াল ডায়ালাইসিস এর তুলানায় খরচ কম
- একটা সেন্টার একই সময় অনেক রোগীর ডায়ালাইসিস হওয়ার কারণে একই ধরনের রোগীদের দেখা হয়, পরস্পরের সাথে কথা বিনিময় হয় এতে তাদের কিছুটা হলেও মনের ভার লাঘব হয়।

পেরিটোনিয়াল ডায়ালাইসিস

সম্পূর্ণ কিডনি বিকল হওয়া রোগীদের বেঁচে থাকার জন্য এটি বহুল ব্যবহৃত একটি ডায়ালাইসিস পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে বাড়িতে বসেই ডায়ালাইসিস নেওয়া যায়, কোন মেশিন বা ডায়ালাইসিস সেন্টারে রোগীকে যেতে হয় না। যে কারণে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে যেখানে হেমোডায়ালাইসিস এর কোন সুযোগ নাই সে সব জায়গায় রোগীরা এ পদ্ধতির চিকিৎসা গ্রহণ করতে পারে। পেরিটোনিয়াল ডায়ালাইসিসে এক ধরণের বিশেষ স্যালাইন পেটের মধ্যে দিয়ে রক্ত বিশুদ্ধ করা হয়। পেরিটোনিয়াল ডায়ালাইসিস সাধারণত ৩ ধরণের

১। আই পি ডি (IPD-Intermittent Peritoneal Dialysis)
২। সি এ পি ডি (CAPD-Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis)
৩। সি সি পি ডি (CCPD-Continuous cycling peritoneal Dialysis)

স্থায়ী কিডনি বিকল রোগীদের কিডনি প্রতিস্থাপন হলো সর্বোত্তম চিকিৎসা। কিন্তু বেশিরভাগ রোগীর ক্ষেত্রে তা সম্ভব হয় না বিভিন্ন কারণে। তাই বিকল্প পদ্ধতি হিসাবে ডায়ালাইসিস চিকিৎসা রোগীর জীবন বাঁচানোর একমাত্র উপায় হয়ে দাঁড়ায়। এ ক্ষেত্রে রোগীর শারীরিক অবস্থা, কি কারণে কিডনি বিকল হয়েছে, তার সামাজিক অবস্থান, শিক্ষা, ডায়ালাইসিস সেন্টার এর সহজলভ্যতা, অর্থনৈতিক অবস্থা, পরিবারের সদস্যদের সহযোগিতা বিবেচনা করেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে কোন রোগীর জন্য ডায়ালাইসিস এর কোন পদ্ধতি উপযোগী।

কিডনি প্রতিস্থাপন ও বাংলাদেশ

অধ্যাপক ডা. মুহাম্মদ রফিকুল আলম
এমবিবিএস, এমডি (নেফ্রোলজি), এফসিপিএস (মেডিসিন)
ইন্টারনাল মেডিসিন ও কিডনি রোগ বিশেষজ্ঞ

সুস্থ কিডনি অতিরিক্ত পানি, মিনারেল ও বর্জ্য পদার্থ শরীর থেকে বের করে দেয়। যখন কিডনি কার্যকারিতা হারায় তখন ক্ষতিকর বর্জ্য শরীরে জমা হতে থাকে। ফলে রক্তচাপ বাড়ে, শরীরে অতিরিক্ত পানি জমা হয় এবং শরীরে পর্যাপ্ত লোহিত রক্তকণিকা তৈরি হয় না। তখন রোগীর অকার্যকর কিডনির প্রতিস্থাপন প্রয়োজন হয়। বাংলাদেশে বিশাল একটি জনগোষ্ঠী কিডনি রোগে ভুগছে এবং পরিসংখ্যানে দেখা গেছে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক রোগী Chronic কিডনি রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। বাংলাদেশে কিডনি রোগের প্রধান কারণগুলো হচ্ছে-

১। নেফ্রাইটিস
২। ডায়াবেটিস ও
৩। উচ্চ রক্তচাপ

কিডনি প্রতিস্থাপন

কিডনি প্রতিস্থাপন হলো একজন মানুষের অকার্যকর কিডনির বদলে কোনো সুস্থ মানুষের কিডনি স্থাপন করা। নতুন স্থাপিত কিডনি অকার্যকর কিডনির বদলে কাজ করতে শুরু করে। নতুন স্থাপিত কিডনির ভিতর দিয়ে রক্ত প্রবাহিত হওয়ার পর স্বাভাবিক কিডনির মত বর্জ্য নিঃসরণ শুরু করে। Chronic Kidney রোগে আক্রান্ত রোগীদের সর্বশেষ চিকিৎসা হচ্ছে ডায়ালাইসিস অথবা কিডনি সংযোজন। যাদের ডায়ালাইসিস অথবা কিডনি সংযোজন দরকার তাদের মধ্যে মাত্র শতকরা ১০ ভাগ লোক কোন না কোন ভাবে ডায়ালাইসিস বা কিডনি সংযোজনের সুবিধা পায়। বাকি ৯০ ভাগ রোগী এ সুবিধা থেকে বঞ্চিত। আর যে ১০ ভাগ রোগী ডায়ালাইসিস বা কিডনি সংযোজনের সুবিধা পায় তাদের মধ্যে মাত্র ৪ ভাগ কিডনি সংযোজন করতে পারে বাকি ৯৬ ভাগ রোগীকে ডায়ালাইসিস করতে হয়।

কিডনি প্রতিস্থাপনের জন্য কিছু পরীক্ষা দরকার

রক্ত : গ্রহীতার রক্তের গ্রুপ অবশ্যই দাতার রক্তের সঙ্গে মিলতে হবে।

এইচ.এল.এ (HLA) ফ্যাক্টর : এটি হচ্ছে হিউম্যান লিউকোসাইট এন্টিজেন যা বংশগতভাবে শ্বেত রক্তকণিকায় থাকে।

সর্তকতা

নতুন কিডনি শরীর যেন প্রত্যাখ্যান না করে সেজন্য ওষুধ খেতে হয়, তেমনি জ্বর, পেটে ব্যথা ও মূত্র তৈরির পরিমাণের দিকেও লক্ষ্য রাখতে হয়। যদি কোনো সমস্যা হয় তবে সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসককে জানাতে হবে। সবকিছু স্বাভাবিক থাকার পরেও কিডনি প্রত্যাখান হতে পারে এবং রোগীকে ডায়ালাইসিস করতে হতে পারে। কিডনি দাতা ও কিডনি গ্রহীতার কিছু পরীক্ষার প্রয়োজন হয় যাতে তাদের পরবর্তী জীবন বিপদমুক্ত থাকে। যদিও অনেকেই কোন রকম বিপদ ছাড়াই কিডনি দান করতে পারে।

কিডনি সংযোজনের ধারণা

- Living Related Transplantation অর্থাৎ কোন একজন সুস্থ ব্যক্তি তার নিকটাত্মীয়কে যখন কিডনি দান করেন।
- Living Unrelated Transplantation অর্থাৎ একজন সুস্থ্য ব্যক্তি কোন অনাত্মীয়কে যখন কিডনি দান করেন।
- Cadaver Transplantation অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির (Brain Dead) রোগীর কিডনি যখন দান করা হয়। তবে বাংলাদেশে Cadaver Transplantation এর কিছু প্রতিবন্ধকতা আছে। যেমন Brain Dead রোগীর আত্মীয় স্বজনের অজ্ঞতা, ধর্মীয় গোঁড়ামী, আইসিইউতে পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধার অভাব।

প্রতিস্থাপনের আইন কানুন

১৯৯৯ সালে এক যুগান্তকারী ঘটনা ঘটে। ঐ বছর বাংলাদেশের পার্লামেন্টে মানবদেহে অঙ্গ সংযোজন আইন পাশ হয়। এই আইনে শুধুমাত্র রোগীর রক্ত সম্পর্কীয় নিকট আত্মীয় অর্থাৎ মা-বাবা আপন ভাইবোন, আপন চাচা, মামা, ফুফু, খালা এবং স্বামী-স্ত্রী তার কিডনি দান করতে পারবেন। অনাত্মীয়ের কিডনি দান এ আইনে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তবে ICU তে Brain Dead (জীবন্মৃত) ব্যক্তির কিডনি নিকট আত্মীয়ের অনুমতি সাপেক্ষে প্রতিস্থাপন করা যাবে (Cadaver Renal Transplantation)। এই আইনের বিধান অনুযায়ী HIV, Hepatitis B/C দ্বারা আক্রান্ত রোগীর কিডনি সংযোজন করা যাবে না। বাংলাদেশের কিডনি সংযোজনের সাফল্যের হার উন্নত দেশগুলোর সাথে তুলনীয়। তবে ডোনারের অভাব, ট্রান্সপ্লান্ট পদ্ধতির ওষুধের উচ্চমূল্য এবং Cadaver Renal Transplantation চালু না হওয়ার ফলে কিডনি সংযোজন রোগীর সংখ্যা আশানুরূপভাবে বৃদ্ধি পায়নি।

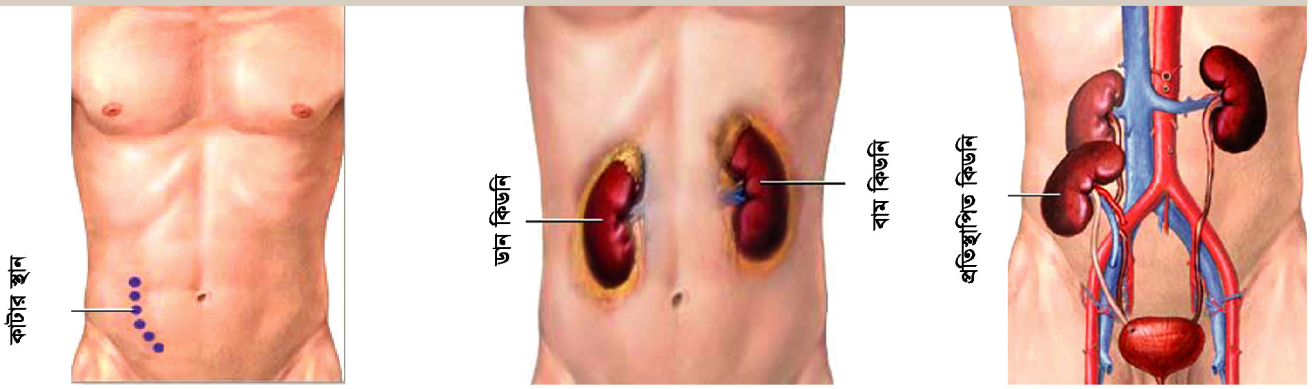

কিডনি গ্রহীতার বিষয়ে কিছু প্রসঙ্গিক কথা

গ্রহীতার যদি ischaemic heart disese থাকে তা হলে কিডনি প্রতিস্থাপনের আগে হৃদরোগের চিকিৎসা করাতে হবে। গ্রহীতার যদি ক্যানসার থাকে তাহলে তার পূর্ণ চিকিৎসার ২ বছর পর কিডনি প্রতিস্থাপন করা যেতে পারে।

কিডনি দাতার বিষয়ে কিছু কথা

- কিডনি দানে ঝুঁকি কতটুকু এটা অনেকে জানতে চান। দাতাকে তার প্রয়োজনীয় তথ্য দিতে হবে।
- কিডনি দাতা হিসাবে কোন ব্যক্তিকে গ্রহণ করার পূর্বে তার পূর্ণাঙ্গ শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে নিতে হবে।
- কিডনি দাতার যদি ডায়াবেটিস বা ক্যানসার থাকে (দু একটি ক্ষেত্র বাদে) তা হলে তাকে দাতা হিসেবে নেয়া যাবে না।
- দাতার যদি ডায়াবেটিস বা উচ্চ রক্তচাপ থাকে সেক্ষেত্রেও তাকে ডোনার হিসেবে নিতে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

প্রতিস্থাপন পদ্ধতি

যদি জীবিত মানুষের কিডনি পাওয়া যায় তবে দাতা এবং গ্রহীতার অপারেশন একই সময়, পাশাপাশি রুমে করা হয়। এক মেডিকেল টিম দাতার কিডনি কেটে আনে, অন্য মেডিকেল টিম গ্রহীতাকে কিডনি গ্রহণের জন্য প্রস্তুত করে। নতুন কিডনির রক্তনালী গ্রহীতার রক্তনালীর সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়। প্রতিস্থাপিত কিডনির মধ্য দিয়ে রক্ত প্রবাহিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কিডনি তার কার্যক্রম শুরু করে।

বাংলাদেশে কিডনি প্রতিস্থাপন

এবার যদি আমরা একটু অতীতের দিকে ফিরে তাকাই তাহলে আমরা দেখতে পাই ১৯৮২ সালে সর্বপ্রথম কিডনি সংযোজন শুরু হয় বাংলাদেশে। দেখা যায়, ১৯৮২ থেকে ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত মাত্র ৬ জন রোগীর কিডনি সংযোজন করা হয় এবং ১৯৮২ থেকে ২০০৩ সাল পর্যন্ত মাত্র একটি সেন্টার অর্থাৎ BSMMU হাসপাতালে কিডনি সংযোজন হত। বর্তমানে Labaid Specialized Hospital সহ আরো ৮-১০টি সেন্টারে নিয়মিত/অনিয়মিত কিডনি সংযোজিত হচ্ছে। এ যাবৎ বাংলাদেশে কিডনি সংযোজন রোগীর সংখ্যা ১০০০ ছাড়িয়ে গেছে। আশার কথা কিডনি প্রতিস্থাপন করতে এখন আর দেশের বাইরে যেতে হয় না। ল্যাবএইডসহ ঢাকার অনেক হাসপাতালেই কিডনি প্রতিস্থাপন করা হচ্ছে নিয়মিত।

কিডনি ক্যান্সার

ডা. রফিকুল আবেদীন
এমবিবিএস, এমএস (ইউরোলজী)
ইউরোলজিষ্ট এন্ড এ্যান্ড্রোলজীষ্ট
প্রস্টেট কিডনি মূত্র থলির ক্যান্সার ও ফিমেল
ইউরোলজীতে উচ্চতর প্রশিক্ষণ (সিঙ্গাপুর)

জনাব মোহাম্মদ আলী (ছদ্মনাম) পেশায় ছিলেন শিক্ষক। বর্তমানে অবসর জীবনযাপন করছেন। বয়স ৭০ বছর। শারীরিক বিবেচনায় সুস্থ্যই ছিলেন। যদিও উচ্চরক্তচাপের জন্যে চিকিৎসা নিচ্ছেন গত ১০ বছর। এখন থেকে ৩ বৎসর পূর্বে হঠাৎ একদিন লক্ষ্য করেন প্রস্রাবের সাথে রক্ত যাচ্ছে। ব্যথা বেদনাহীন রক্তমিশ্রিত প্রস্রাব। প্রাথমিক পর্যায়ে একটু ভীত বিব্রত হলেন। জানালেন নিকটজনদের। স্মরণাপন্ন হলেন স্থানীয় একজন চিকিৎসকের। চিকিৎসকের পরামর্শে একটি অ্যান্টিবায়োটিক, সাথে অধিকমাত্রায় পানি পান করলেন। ১-২দিন পরে প্রস্রাব পরিস্কার হলো। ভাবলেন বন্ধ হলো রক্তপাত। কোন পরীক্ষা-নিরীক্ষায় গেলেন না। ৭-১০ দিনের মাথায় আবার লাল রক্তমিশ্রিত প্রস্রাব। হাজির হলেন পূর্বের ঐ চিকিৎসকের কাছে। এবার ঐ চিকিৎসক জানালেন আপনার একজন ইউরোলজি বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন। মোহাম্মদ আলী দেরি না করে সোজা এলেন ইউরোলজিস্ট এর কাছে। এই ইউরোলজিস্ট এক সময় তার ছাত্র ছিল। এবার ইউরোলজিস্ট চিকিৎসক তার শ্রদ্ধেয় শিক্ষককে কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করালেন। পরীক্ষার প্রাথমিক পর্যায়ে আল্ট্রাসনোগ্রাফিতে পাওয়া গেল মোহাম্মদ আলী সাহেবের ডান কিডনিতে একটা টিউমারের উপস্থিতি। কিডনির কাজ করবার ক্ষমতা স্বাভাবিক আছে দেখে CT Urography সহ আরো কিছু পরীক্ষা করালেন চিকিৎসক। নিশ্চিত হলেন মোহাম্মদ আলী সাহেবের অসুস্থতা সম্পর্কে। টিউমারটি এখনও কিডনির মধ্যেই সীমাবদ্ধ আছে। ইউরোলজিস্ট তার শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষককে এ রোগ ও চিকিৎসা সম্পর্কে বিস্তারিত জানালেন। বিস্তারিত জেনে মোহাম্মাদ আলী সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি চিকিৎসায় যাবেন। অত:পর চিকিৎসা হলো।

গত তিন বৎসর মোহাম্মদ আলী তিন মাস, ছয় মাস পরপর ফলোআপ করে যাচ্ছেন। চিকিৎসা পরবর্তীকালে তিনি এখনও সম্পূর্ণ সুস্থ আছেন। এখনও উচ্চরক্তচাপের ওষুধ খেয়ে যাচ্ছেন তবে পরিমানে কম লাগছে। স্বাভাবিক খাবার, চলাফেরাসহ প্রতিদিনের কাজ নিজে করছেন। মোহাম্মদ আলী সাহেবের মন্তব্য 'আমি ভাবতেই পারিনি কিডনি ক্যানসার হবার পরে চিকিৎসা নিয়ে এতো ভাল থাকা যায়। তবে যে সবাই বলে ক্যান্সার চিকিৎসায় লাভ হয় না। এ কথাতো দেখছি ঠিক না।'

এ কথাটা সবার জানা দরকার। কিডনি ক্যান্সার হয়েছে জেনেই হতাশায় ডুবে যাবার কোন মানে নেই। সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসাই বোধকরি প্রয়োজন।

হ্যাঁ পাঠক, এটাই সত্য। কিডনিতে টিউমার-ক্যান্সার হতেই পারে। আর মোহাম্মদ আলী সাহেবের মতো অনেকেই চিকিৎসা নিয়ে প্রায় সুস্থ্য জীবনযাপন করছেন।

কিডনিতে টিউমার হলেই কি তা ক্যান্সার?

কথাটি সর্বাংশে সত্য নয়। তবে প্রায় শতকরা ৯০-৯৫ ভাগ কিডনির সলিড টিউমার ক্যান্সার জাতীয়। তাই কিডনিতে টিউমারের উপস্থিতি পাওয়া গেলে তাকে ক্যান্সার হিসেবেই বিবেচনা করা উচিত যতক্ষণ অন্য কিছু হিসেবে রোগ নির্ণয় (Diagnosis) করা না যাচ্ছে।

কত বয়সে হয় কিডনিতে ক্যান্সার?

যে কোন বয়সেই হতে পারে। তবে সিংহ ভাগ কিডনি ক্যান্সার হয় পরিনত বয়সে ৬০ বৎসরের উর্ধ্বে। সাধারণত ৪০ বছরের পর থেকে এ প্রবণতা বাড়তে থাকে।

ছোট বাচ্চাদের কিডনি ক্যান্সার হয় না?

হতে পারে। সাধারণত শিশুদের Wilm's Tumour নামক এক বিশেষ ধরণের কিডনি টিউমার হয়। যা পূর্ণ বয়স্কদের কিডনি ক্যান্সার থেকে একটু ভিন্ন।

কি কি কারণে কিডনি ক্যান্সার হয়?

- যাদের বয়স ৬০ এর উপর
- যারা ধূমপান করেন
- যাদের ওজন বেশি
- যারা উচ্চরক্ত চাপে ভূগছেন
- যাদের নিকট আত্মীয়দের কিডনি ক্যান্সার হবার ইতিহাস রয়েছে
- যে সকল রোগী দীর্ঘদিন ডায়ালাইসিস নিচ্ছেন
- কিছু জেনেটিক অসুখের কারণে

কিডনি ক্যান্সারের উপসর্গ কি কি?

প্রায় ৭০ শতাংশ কিডনি ক্যান্সারের রোগীর প্রাথমিক পর্যায়ে কোন উপসর্গ থাকে না। কারো কারো পেটের উপরিভাগে বক্ষ পিঞ্জরের নীচে চাকা অনুভূত হয়। এ ছাড়া কিডনি ক্যান্সারের রোগীরা–

- প্রস্রাবে রক্ত যাওয়া
- কাশিতে রক্ত • বুকে ব্যথা
- হাড়ের ব্যথা • জন্ডিস
- রক্ত শূণ্যতা • উচ্চ রক্তচাপ • ওজন কমে যাওয়া
- অতিরিক্ত দূর্বলতাসহ নানা উপসর্গ নিয়ে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়ে থাকেন

কিডনি ক্যান্সার নির্ণয় বা সুনির্দিষ্টভাবে নির্ণয় (Diagnosis) করা যায় কি উপায়ে?

- চিকিৎসক রোগীর পূর্ণ ইতিহাস জেনে নেবেন
- চিকিৎসক রোগীকে শারীরিকভাবে পরীক্ষা করবেন
- কিছু প্রাথমিক ল্যাবরেটরী পরীক্ষা করতে হবে
- কিডনি ও মূত্রতন্ত্রের আল্ট্রাসনোগ্রাম
- প্রস্রাবের অনুবীক্ষন যন্ত্রের সাহায্য পরীক্ষা (Routine Microscope Examination)
- রক্তে ক্রিয়েটিনিনের পরিমাণ জেনে নিতে হবে

কিছু বিশেষ ল্যাবরেটরী পরীক্ষা কিডনি ক্যান্সার নিশ্চিত হতে ও তার বিস্তৃতি সম্পর্কে জানতে করা প্রয়োজন হয়।

- CT Scan KUB/CT Urography
- FNAC of Tumour
- CT Chest/X-ray Chest
- Liver Function Test
- Radio Isotope Bone Scan

কিডনি ক্যান্সারের চিকিৎসা কি?

শৈল্য চিকিৎসা (Surgery) হচ্ছে কিডনি ক্যান্সারের মূল চিকিৎসা। কিডনি ক্যান্সার সাধারণত Chemotherapy resistant, Chemotherapy দিয়ে কাঙ্খিত ফল লাভ প্রায় অসম্ভব। কিডনি ক্যান্সারে Radiotherapy দিয়ে চিকিৎসায়ও ভাল ফল লাভ করা যায় না। Targeted Immunotherapy এ চিকিৎসায় এটি নতুন সংযোজন এবং সম্ভাবনাময়।
অন্য সকল ক্যান্সারেরন্যায় কিডনি ক্যান্সারের চিকিৎসাও প্রাথমিক পর্যায়ে করা গেলে চমৎকার ফললাভ সম্ভব। অনেক ক্ষেত্রেই প্রায় নিরাময় লাভ সম্ভব।

কিডনি ক্যান্সার চিকিৎসার পরিকল্পনা বা পদ্ধতি নির্ধারণ কি করে করা হয়?

কিডনি ক্যান্সারের ধরণ, বিস্তৃতি, রোগীর বয়স, হৃদযন্ত্র, ফুসফুসের অবস্থা বিবেচনা করে সাধারণত ইউরোলজিস্ট এ সিদ্ধান্ত দিয়ে থাকেন। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে বা প্রয়োজনে ইউরোলজিস্ট, অনকোলজিস্ট, রেডিওলজিস্ট, প্যাথলজিস্ট, নেফ্রোলজিস্ট যৌথভাবে সংশ্লিষ্ট সকল বিষয় পর্যালোচনা করে এ সিদ্ধান্ত দিয়ে থাকেন।

সর্বশেষ

শুধু রোগী নয়। রোগীর নিকট আত্মীয়দেরকেও রোগীর অসুখ সম্পর্কে বিস্তারিত জানানো উচিত। রোগী ও দায়িত্ববান নিকট আত্মীয়দের উপস্থিতিতে

-অসুখের ধরণ

-অসুখের বিস্তৃতি

-অসুখের সম্ভাব্য ভয়াবহতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানাতে হবে

-কিডনি ক্যান্সারের চিকিৎসা পদ্ধতিগুলো সম্পর্কে বলতে হবে

-শৈল্য চিকিৎসার সম্ভাব্য ফলাফল, ঝুঁকি সম্পর্কেও অবহিত করতে হবে।

এছাড়া রোগী চাইলে দ্বিতীয় একজন ইউরোলজিস্টের মতামত (Second Opinion) নিতে তাকে উৎসাহিত করতে হবে।

অ্যান্টিবায়োটিকের রকম ফের

অ্যান্টিবায়োটিককে কাজের পদ্ধতি, রাসায়নিক গঠন, কাজের পরিধির উপর ভিত্তি করে বিভিন্নভাগে ভাগ করা যায়। যেমন- কাজের পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে অ্যান্টিবায়োটিককে Bactericidal (যা ব্যাকটেরিয়াকে ধ্বংস করে) ও Bacteriostatic (যেগুলো ব্যাকটেরিয়ার বৃদ্ধিকে রোধ করে) এই দুই ভাগে ভাগ করা যায়। আবার কাজের পরিধির উপর ভিত্তি করে অ্যান্টিবায়োটিককে Narrow spectrum এবং Broad spectrum antibiotic-এ ভাগ করা যায়।

এছাড়াও কাজের পরিধির উপর ভিত্তি করে Cephalosporin জাতীয় অ্যান্টিবায়োটিককে ৫টি Generation এ ভাগ করা হয়ে থাকে। Cephalosporin গ্রুপের প্রথম দিকের অ্যান্টিবায়োটিকগুলোকে বলা হয় 1st Generation Cephalosporin. এর পরের গুলোকে বলা হয় 2nd Generation Cephalosporin. যেমন- Cefuroxime (Roxilab) এভাবে ক্রমান্বয়ে তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম প্রজন্মের Cephalosporin এসেছে। নতুন Generation এর প্রতিটি অ্যান্টিবায়োটিক সাধারণত পূর্বের Generation এর চেয়ে বড়

পরিধিতে কাজ করতে সক্ষম। এদের মধ্যে 4th Generation Cephalosporin কে True Broad Spectrum Antibiotic হিসেবে ধরা হয়।

ল্যাবএইড ফার্মা সেফুরক্সিম বাজারে এনেছে 'Roxilab' নামে । যা 2nd Generation Cephalosporin.

Roxilab

Cefuroxime 250 & 500 mg Tablet
and 125 mg/5ml PFS

A reliable antibiotic against bacterial infections

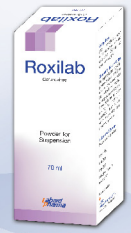

Roxilab direct compressed tablet ensures

- Faster dissolution
- Increased stability

Roxilab PFS with **Taste Masked Granules** removes bitterness and offers improved palatability

Labaid Pharma Quality First...

হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ

ডাঃ মোহাম্মাদ ফারহাদ উদ্দীন

এমবিবিএস (ঢাকা), বিসিএস (স্বাস্থ্য) এমডি (কার্ডিওলজি)
হৃদরোগ, উচ্চরক্তচাপ ও মেডিসিন বিষয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত
কনসালটেন্ট, কার্ডিওলজি।
চেম্বার : ল্যাবএইড লিমিটেড
সময় : বিকাল ৩টা-সন্ধ্যা ৬টা (শুক্রবার বন্ধ)

ক্লিনিক্যাল এবং ইন্টারভেনশনাল কার্ডিওলজিস্ট

অধ্যাপক ডাঃ মোঃ আফজালুর রহমান

এমবিবিএস, এমডি (কার্ডিওলজি), পিএইচডি (কার্ডিওলজি)
এফআরসিপি (গ্লাসগো), এফআরসিপি (এডিন), এফএসিসি (ইউএসএ)
ফেলোশীপ ইন ইন্টারভেনশনাল কার্ডিওলজি (ইউএসএ, ফ্রান্স)
অধ্যাপক, কার্ডিওলজি বিভাগ
জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, ঢাকা।
চেম্বার : ল্যাবএইড লিমিটেড
সময় : বিকাল ৩টা-সন্ধ্যা ৬টা (শুক্রবার বন্ধ)

মেডিসিন ও নিউরোমেডিসিন বিশেষজ্ঞ

অধ্যাপক কর্ণেল (ডাঃ) মোহাম্মদ মজিবর রহমান

এমবিবিএস (ঢাকা), এফসিপিএস (মেডিসিন)
ফেলো ইন নিউরো ফিজিওলজি (তুরস্ক)
চেম্বার : ল্যাবএইড লিমিটেড (এনেক্স)
সময় : সকাল ১০টা-দুপুর ২টা (শুক্রবার বন্ধ)

মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ

ডাঃ সাইফুন নাহার

এমবিবিএস, এফসিপিএস, বিসিএস (স্বাস্থ্য)
মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ ও সাইকোথেরাপিস্ট
সহকারী অধ্যাপক
জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা
চেম্বার : ল্যাবএইড কার্ডিয়াক হাসপাতাল (এনেক্স)
সময় : দুপুর ৩টা-বিকাল ৫টা (শুক্রবার বন্ধ)

মেডিসিন ও বক্ষব্যাধি বিশেষজ্ঞ

অধ্যাপক ডাঃ মোহাম্মদ আতিকুর রমান

এমবিবিএস (ডিএমসি), এমডি (চেস্ট ডিজিজেস)
অধ্যাপক মেডিসিন বিভাগ (রেসপিরেটরি ডিজিজেস)
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়
চেম্বার : ল্যাবএইড কার্ডিয়াক হাসপাতাল
সময় : দুপুর ৩.৩০টা-সন্ধ্যা ৬.৩০টা (শুক্রবার বন্ধ)

সহযোগী অধ্যাপক

ডাঃ রিয়াজ উদ্দিন আহমদ

চর্ম, যৌন, এলার্জী ও কুষ্ঠ রোগ বিভাগ
বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকা
চেম্বার : ল্যাবএইড কার্ডিয়াক হাসপাতাল
সময় : শুক্রবার ১০.০০টা-দুপুর ১২.০০টা

কনসালট্যান্ট, অর্থোপেডিক ও স্পাইন বিভাগ

ডাঃ এরফানুল হক সিদ্দিকী

এমবিবিএস (ডিএমসি), এমএল (অর্থো)
ট্রমা, হাঁড় জোড়া, বাত ব্যথা, ঘাড়, কোমর, হাটু ব্যথা ও স্পাইন সার্জন
কনসালট্যান্ট, অর্থোপেডিক ও স্পাইন বিভাগ
চেম্বার : ল্যাবএইড ডায়াগনস্টিক লিমিটেড
সময় : সন্ধ্যা ৭টা -রাত ১০টা (শুক্রবার বিকাল ৫টা-রাত ৮টা)

সহকারী অধ্যাপক

ডাঃ ফোয়ারা তাসমীম পালমি

এমবিবিএস (ডিএমসি), এমএস
বার্ণ ও প্লাস্টিক সার্জারি ইউনিট
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
চেম্বার : ল্যাবএইড লিমিটেড (এনেক্স)
সময় : বিকাল ৩টা - বিকাল ৫টা (শুক্রবার বন্ধ)

জানা অজানার অ্যান্টিবায়োটিক

অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করা হয় বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়া, প্রোটোজোয়া জাতীয় জীবাণুর বিরুদ্ধে। এই জীবাণুগুলো যদি অ্যান্টিবায়োটিকের কর্মক্ষমতাকে প্রতিরোধ করার মতো শক্তিশালী হয়ে উঠে তা হলে তাদেরকে অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধী জীবাণু (Resistant organism) বলা হয়। এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন জীবাণুগুলো অ্যান্টিবায়োটিক এর উপস্থিতিতে বেঁচে থাকে। বিভিন্ন কারণে এ ধরণের ঘটনা ঘটে থাকে। কখনো কখনো প্রাকৃতিক কারণে আবার কখনো মানুষের সৃষ্ট কারণে ব্যাকটেরিয়া অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধী হয়ে উঠে।

যেখানে অ্যান্টিবায়োটিক এর কোন ভূমিকা নেই, যেমন সাধারণ সর্দি-কাশি, ভাইরাল ইনফেকশন এসব ক্ষেত্রে অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করা হলে সেখানে উপকার তো হয়ই না বরং অ্যান্টিবায়োটিক এর ক্ষমতা কমে যেতে শুরু করে।

এছাড়া আর একটি সমস্যা হল অ্যান্টিবায়োটিক এর কোর্স সম্পূর্ন না করা। অ্যান্টিবায়োটিক কোর্স শুরু করার পর রোগের উন্নতি হয়। সেক্ষেত্রে অ্যান্টিবায়োটিক সেবন হঠাৎ করে বন্ধ করে দিলে অ্যান্টিবায়োটিকটি তার কার্যক্ষমতা হারাতে শুরু করে। কারণ অ্যান্টিবায়োটিক কোর্স শুরু করলে তা কিছু জীবাণু ধ্বংস করে কিন্তু কোর্স সম্পূর্ণ না করলে সব জীবাণু ধ্বংস হয় না। ফলে মাঝপথে অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার বন্ধ করলে বেঁচে যাওয়া জীবাণুগুলো অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধী হয়ে উঠে এবং তাদের বংশ বৃদ্ধি ঘটে।

ল্যাবএইড ফার্মা'র সেফিক্সিম ফার্মেসিতে পাওয়া যাচ্ছে 'Cephoral' নামে যা USDMF Grade- এর কাঁচামাল থেকে প্রস্তুত করা হয়েছে।

Cephoral

Cefixime 200 & 400 mg Capsule and 100 mg/5 ml PFS

An outstanding breakthrough with quality ingredients

USDMF grade and European sourced Cefixime ensures...

- The best quality API
- Better therapeutic efficacy
- Maximum patients' safety

Labaid Pharma Quality First...

শিশুদের জন্মগত কিডনি রোগ

অধ্যাপক ডাঃ খায়রুল আমিন
এমবিবিএস (ঢাকা), ডিসিএইচ (গ্লাসগো), এমআরসিপি (ইউকে)
এফআরসিপি (এডিন), এফআরসিপি (গ্লাসগো)
শিশু রোগ বিশেষজ্ঞ
প্রাক্তন একাডেমিক ডিরেক্টর
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব চাইল্ড হেলথ, ঢাকা শিশু হাসপাতাল।

প্রতি হাজার শিশুর মধ্যে কমপক্ষে একজন শিশু কিডনির জটিলতা নিয়ে জন্ম গ্রহণ করে। এরমধ্যে কিছু কিছু খুবই মারাত্মক এবং চিকিৎসকদের বিশেষ কিছু করার থাকে না। জন্মের কিছুদিনের মধ্যে মৃত্যুবরণ করে। আবার কয়েকটি জন্মগত কিডনি রোগ শৈল্য চিকিৎসার (Surgery) মাধ্যমে সম্পূর্ণ নিরাময় করা যায়। জন্মগত কিডনি রোগ (Congenital Kidney Diseases) আমরা কয়েকটি ভাগে ভাগ করতে পারি।

১. Parenchymal diseases
২. Hydronephrosis with obstruction
৩. Hydronephrosis without obstruction
৪. Polycystic kidney disease (PKD)
৫. জন্মগত Metabolic রোগ

কিডনির জন্মগত Parenchymal diseases রোগে আলট্রাসনোগ্রাফি বা X-ray তে কিডনিকে স্বাভাবিক মনে হবে। কিন্তু সূক্ষ অনুবীক্ষণ যন্ত্রে পরীক্ষা করলে ত্রুটি ধরা পড়ে। এ রোগে কিডনি বিভিন্নমাত্রায় অকার্যকর থাকতে পারে। মারাত্মক ক্ষেত্রে শিশুর জন্মের সাথে সাথেই Dialysis এর প্রয়োজন হয়।

Hydronephrosis এর অর্থ হল কিডনির যে অংশে মূত্র জমা হয় অর্থাৎ Pelvis এবং Ureter ফুলে যাওয়া। এটি হয় যখন কিডনি থেকে মূত্র যে পথে মূত্রথলী, মূত্রনালী দিয়ে বাইরে বের হয়ে আসে তার যে কোন অংশে বাঁধাপ্রাপ্ত হয়। যে সমস্ত কারণে মূত্র প্রবাহ বাঁধাপ্রাপ্ত (Obstruction) হয়ে Hydronephrosis হয় সেগুলো হল :

Posterior urethral valves
Ureteropelvic Junction (UPJ) obstruction
Ureterovesical junction obstruction
Ureterocoele
Neurogenic bladder

Posterior urethral valve জন্মগত ত্রুটিগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায়। এই ত্রুটি শুধুমাত্র ছেলে শিশুদের হয়ে থাকে। মূত্রনালীতে এক অংশে কোষ বৃদ্ধির কারণে একটি Valve এর সৃষ্টি হয় এবং স্বাভাবিক মূত্র প্রবাহ বাঁধাগ্রস্থ হয়। অপারেশনের মাধ্যমে Valve টি সরিয়ে মূত্রনালীর স্বাভাবিক প্রবাহ আনা যায় এবং শিশুটি সুস্থ হয়ে যায়।

UPJ Obstruction সার্জারির মাধ্যমে সম্পূর্ণ সুস্থ করা যায় শিশুকে। এই সার্জারি বেশ নিরাপদ ও সফল এবং মাত্র ২/৩ দিনের বেশি হাসপাতালে থাকার প্রয়োজন হয় না। জন্মের সাথে সাথে সনাক্ত হলে আর যদি এক দিকেই হয় তখন কয়েক মাস অপেক্ষা করে শিশুটি একটু সবল হলে তখন সার্জারি করা যায়।

Ureterovesical junction obstruction খুব কম পাওয়া যায়। এ ত্রুটিরও চিকিৎসা সার্জারি।

Neurogenic bladder সাধারণত Spinal cord এর সমস্যার সাথে হয়ে থাকে। এটি অত্যন্ত জটিল রোগ। Neurogenic

Bladder এর কারণে Kidney নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে Cystic Kidney disease বুঝাতে Polycystic Kidney disease (PKD) বুঝায়। এটি একটি বংশানুক্রমিক রোগ এবং দু'ধরনের অর্থাৎ Autosomal dominant এবং Autosome recessive হতে পারে। এই রোগের জন্য শিশু অবস্থায় ডায়ালাইসিস এমনকি খুব অল্প বয়সেই Renal Transplant প্রয়োজন হতে পারে।

Cystinosis একটি Metabolic রোগ যেখানে Cysteine নামক একটি Amino acid শরীরের কোষে জমা হয়ে Kidney সহ অন্যান্য Organ নষ্ট করতে পারে। Cystinosis একটি অতি বিরল রোগ। মোটামুটিভাবে উল্লেখিত রোগগুলোই শিশুদের জন্মগত Kidney রোগ।

জানতে হবে, মানতেও হবে

অ্যান্টিবায়োটিক সর্বরোগের মহৌষধ নয়: সব ধরণের অসুস্থতায় অ্যান্টিবায়োটিক কাজ করবে, এটা ভাবা ঠিক নয়। অসুস্থ হলেই অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়া শুরু করবেন না। সাধারণ জ্বর-সর্দি-কাশি প্রধানত ভাইরাসের কারণে হয়ে থাকে। তাই এ ক্ষেত্রে অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারের কোনো যৌক্তিকতা নাই।

চিকিৎসককে অ্যান্টিবায়োটিক এর ব্যবস্থাপত্র দেওয়ার জন্য চাপ দেবেন না: বিভিন্ন ভাইরাল ইনফেকশন তো বটেই, অনেক ব্যাক্টেরিয়াল ইনফেকশনও অ্যান্টিবায়োটিক ছাড়াই ভাল হয়ে যায়। আমাদের শরীরের স্বাভাবিক রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাই এই কাজটি করতে পারে।

যথানিয়মে অ্যান্টিবায়োটিক সেবন করবেন: চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী নির্দিষ্ট ডোজের অ্যান্টিবায়োটিক নির্দিষ্ট সময়ে সেবন করুন। রোগ লক্ষণের উন্নতি হলেই অ্যান্টিবায়োটিক বন্ধ করবেন না। অবশ্যই অ্যান্টিবায়োটিকের কোর্স সম্পূর্ণ করবেন।

চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র ছাড়া কখনোই অ্যান্টিবায়োটিক সেবন করবেন না: আমাদের দেশে চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র ছাড়াই ফার্মেসিতে অ্যান্টিবায়োটিক বিক্রি হয়। কখনই চিকিৎসক ছাড়া অন্য কারো পরামর্শে অ্যান্টিবায়োটিক সেবন করবেন না। নিজের ইচ্ছে মতো অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারের মাধ্যমে আপনি নিজের অজান্তেই রোগ জীবাণুকে অ্যান্টিবায়োটিকের বিরুদ্ধে শক্তিশালী করে তুলছেন।

রোগজীবাণু থকে নিরাপদ থাকুন: নিজে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকুন। অসুস্থ হলে খেয়াল রাখুন, যাতে আপনার দ্বারা রোগজীবাণুর বিস্তার না ঘটে।

প্রতিকারের চাইতে প্রতিরোধ উত্তম, তাই প্রয়োজনীয় টিকা নিন।

ল্যাবএইড ফার্মা USDMF Grade- এর সিপ্রোফ্লক্সাসিন 'Ciproaid' নামে বাজার জাত করছে।

Ciproaid

Ciprofloxacin 500 mg Tablet

USDMF grade Ciprofloxacin

USDMF grade Ciproaid offers

- The best quality of raw materials
- Better therapeutic efficacy
- Maximum patients' safety

labaid pharma Quality First...

কিডনির সুস্থতায়

ডা.সিদ্ধার্থ মজুমদার

দেহের যে কোনো অঙ্গের গোলযোগ নানা উপসর্গের মধ্য দিয়ে শরীর জানান দিতে থাকে। কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী কিডনি রোগের বেলায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দীর্ঘদিন রোগীর কোনো উপসর্গ দেখা যায় না। প্রাথমিকভাবে খাবারে অনীহা, বমি বমি ভাব, প্রস্রাবের পরিমাণে তারতম্য, ঝিমুনি, ক্লান্তি প্রভৃতি উপসর্গ দেখা দিতে পারে। যেগুলোকে রোগী সাধারণ ক্লান্তি বা দূর্বলতাজনিত বলে এড়িয়ে যান, চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন না। প্রাথমিক পর্যায়ে কিডনি রোগ ধরা পড়লে জটিল বা ব্যয়বহুল চিকিৎসা এড়ানো যেতে পারে সহজেই।

- শিশুদের গলাব্যথা, চর্মরোগ প্রভৃতির দ্রুত চিকিৎসা করাতে হবে। এসব রোগ থেকেও কিডনির প্রদাহ হতে পারে
- ডায়রিয়া, বমি, রক্ত-আমাশয়, পানিশূণ্যতায় আক্রান্ত হলে দ্রুত চিকিৎসা করাতে হবে, কারণ এসব থেকে কিডনি বিকল হতে পারে
- প্রস্রাবে ইনফেকশন হলে দ্রুত চিকিৎসা করাতে হবে

- কিডনি ভালো রাখতে পর্যাপ্ত পানি পান করতে হবে
- নিয়মিত রক্ত চাপ মেপে দেখা এবং নিয়ন্ত্রনে রাখতে হবে
- ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। এটি কিডনি ভালো রাখার জন্য জরুরি
- সুষম খাদ্য গ্রহণ করতে হবে। অতিরিক্ত মাছ-মাংস-ডিম বা হাই-প্রোটিন ডায়েট কিডনির জন্য ক্ষতিকর
- ধূমপান থেকে বিরত থাকতে হবে
- রক্তের সুগার নিয়মিত নিয়ন্ত্রণে রাখাটা জরুরি
- নিয়মিত ব্যায়াম করতে হবে
- চিকিৎসকের পরামর্শ ব্যতীত অ্যান্টিবায়োটিক, ব্যথানাশক প্রভৃতি ওষুধ খাওয়া যাবে না

হৃদস্বাস্থ্যের ভালো মন্দ

ধূমপান, উচ্চরক্ত চাপ, ডায়াবেটিস, কোলেস্টেরলের মত বিষয়গুলো হৃদরোগের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। তবে নতুন এক গবেষণায় দেখা গেছে, নিত্যদিনের অতি সাধারণ কিছু ঘটনা হৃদস্বাস্থ্যে ব্যাপকভাবে প্রভাব ফেলে।

ঘুম : হৃদরোগে ঘুমের প্রভাব দেখতে দীর্ঘদিন ধরে একটি গবেষণা চালানো হয়। এই গবেষণায় ১৫ হাজার মানুষকে ১৪ বছর ধরে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয়। দেখা যায়, যাদের জীবনযাত্রা খুব স্বাভাবিক এবং যারা নিয়মিত ব্যায়াম ও সঠিক খাদ্যাভাসে অভ্যস্ত, তাদের হৃদরোগে মৃত্যুর শঙ্কা প্রায় ৬৭ শতাংশ কম। অন্যদিকে যাদের ঘুমের পরিমাণ ৭ ঘণ্টা বা তার থেকে বেশি ছিল, তাদের হৃদরোগে মৃত্যুর শঙ্কা কমে যায় ৮৩ শতাংশ। তাই নিয়মিত আরাম করে ঘুমান। হৃদরোগের ঝুঁকি কমবে।

সুখ : আরেকটি গবেষণায় দেখা গেছে, সুখী মানুষেরা হৃদরোগে কম ভোগেন। পঁচিশ বছর ধরে এই গবেষণায় দেখা গেছে, সুখী ও আশাবাদী মানুষের হৃদরোগের ঝুঁকি অন্যদের তুলনায় তিন ভাগের এক ভাগ মাত্র। অন্যদিকে যারা অতিমাত্রায় দুশ্চিন্তাগ্রস্থ থাকেন, তাদের হৃদস্বাস্থ্যও ঝুঁকিতে থাকে।

বায়ু দূষণ : বায়ু দূষণ ব্যাপকভাবে হৃদস্বাস্থ্যে প্রভাব ফেলে। এছাড়া পরোক্ষ ধূমপান, গাড়ির ধোঁয়া অত্যন্ত ক্ষতিকর হৃদপিন্ডের জন্য। যারা হৃদরোগী এবং যারা নিজের হৃদপিন্ডকে দীর্ঘদিন সুস্থ্য দেখতে চান। অবশ্যই তারা দূষিত বায়ু এড়িয়ে চলবেন।

মানসিক চাপ : দীর্ঘদিনের মানসিক চাপ দেহে করটিসোল এবং এড্রেনালিনের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়, যেটা রক্তে চিনির পরিমাণ বাড়িয়ে দিয়ে রক্তনালী শক্ত করে ফেলে। যেটি হৃদপিন্ডের জন্য অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। তাই নিজেকে নির্ভার রাখার চেষ্টা করুন। মানসিক চাপ দূরে রাখুন।

রিডার্স্ট ডাইজেস্ট অবলম্বনে

কিডনি চিকিৎসার বৃত্তান্ত

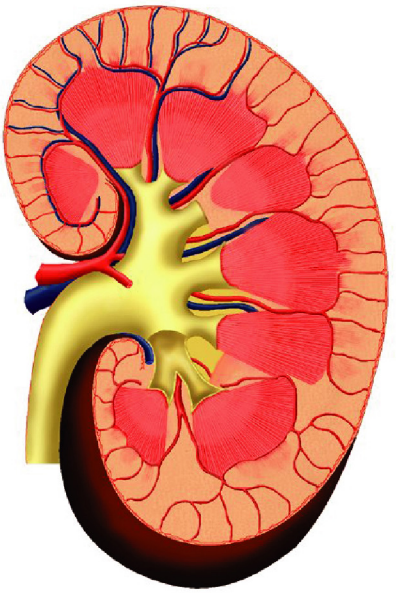

- ESWL (Extra Corporeal Shock Wave Lithotripsy)
- PCNL (Percutaneous Nephrolithotomy)
- URS (Uretero Renoscopy)
- ICPL (Intra Corporeal Pneumatic Lithotripsy)
- Kidney Transplant
- Kidney Cancer

এবং সবধারণের কিডনি জটিলতা এবং সমস্যাগুলোর সমাধানে ল্যাবএইডে আছে সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ও দক্ষ চিকিৎসকবৃন্দ। ল্যাবএইডে আজই পরীক্ষা করে জেনে নিন আপনার কিডনি সুস্থ কি না এবং প্রতিবছর অন্তত একবার কিডনির সুস্থতা যাচাই করে নিন।

Urine R/M/E	=150/-
S. Createnine	=330/-
USG of KUB ē PVR	=1800/-
S. Electrolytes	=880/-
Urine For Micro albumin	=800/-
Random Blood Sugar	=230/-

স্বাস্থ্য বিষয়ক যে কোন ধরণের সমস্যায় সবসময় আপনার পাশে আছে ল্যাবএইড। স্বাস্থ্য সম্পর্কিত যে কোন জিজ্ঞাসার উত্তর পেতে যোগাযোগ করতে পারেন এই ঠিকানায়-*health.labaid@gmail.com*

কিডনি ও খাওয়া দাওয়া

সালমা পারভীন
নিউট্রিসনিস্ট

সুস্থতার জন্য ওষুধের পাশাপাশি খাদ্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে থাকে। সে রকমভাবেই কিডনি রোগের জন্য সম্পূর্ণ নতুন ধরণের একটি খাদ্য তালিকা শুধু রোগীকে সুস্থ রাখবে তা নয়, এটি কিডনি রোগীর কিছু কিছু জটিলতা যেমন শরীরে পানির ভারসাম্যতা রক্ষা, উচ্চ রক্তচাপ, হাড়ের রোগ, ওজন হ্রাস থেকেও রক্ষা করবে।

রোগীর রোগের তীব্রতার উপর নির্ভর করে রোগীর পথ্য তৈরি করা হয়ে থাকে। তবে সাধারণভাবে কিডনি রোগে যে সমস্ত খাদ্যপ্রাণ (Nutrients) বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হয় তা হলো-

- প্রোটিন
- ফসফরাস
- ক্যালসিয়াম
- পটাসিয়াম
- সোডিয়াম
- পানি

এছাড়াও আয়রণ ও ক্যালরি খুবই প্রয়োজনীয় কারণ বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই কিডনি রোগীরা রক্ত স্বল্পতা ও অপুষ্টিতে (Malnutrition) ভূগে থাকেন। কিডনি রোগীদের জন্য যে সমস্ত খাদ্য তৈরি হবে তাতে নিচের উপাদানগুলো কম পরিমানে থাকতে হবে।

- লবণ (সোডিয়াম)
- ফসফরাস
- ক্যালরিযুক্ত খাবার
- প্রোটিন

কিডনি রোগীর জন্য খাদ্য ডায়ালাইসিস শুরুর আগে ও পরে ভিন্ন হয়। এক নজরে চার্ট থেকে জেনে নেয়া যাক :

ডায়ালাইসিসের আগে ও পরে যে ধরণের খাবার খেতে হবে

ডায়ালাইসিসের আগে	ডায়ালাইসিসের পরে
প্রোটিন, সোডিয়াম, ফসফরাস, পটাশিয়াম নিয়ন্ত্রিত খাবার, সাধারণ ক্যালরিযুক্ত খাবার	উচ্চ প্রোটিনযুক্ত খাবার, উচ্চ ক্যালরিযুক্ত খাবার

কিডনি রোগীর খাদ্য

কিডনি রোগীর জন্য খাদ্য তালিকা তৈরিতে যে সমস্ত বিষয়গুলো লক্ষ্য রাখতে হবে তা হলো

প্রোটিন আমাদের শরীরের জন্য খুবই প্রয়োজনীয় একটি খাদ্য উপাদান কিন্তু কিডনি রোগীদের জন্য এই প্রোটিন, অতিরিক্ত পরিমাণে গ্রহণ করলে রোগীর রক্তের ইউরিয়া পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। সেই জন্য নিয়ন্ত্রিত প্রোটিন গ্রহণ করতে হবে।

উচ্চমান প্রোটিন (Good Protin)	নিম্নমান প্রোটিন (Bad Protin)
মুরগী, মাছ, ডিম, দুধ ও দুধ জাতীয় খাবার	ডাল ও ডাল জাতীয় খাবার, সয়া বা সয়া মিল্ক, যেকোন ধরনের বিচি

ফসফরাস

ফসফরাস হলো এক ধরনের খনিজ (Mineral) যা ক্যালসিয়ামের সঙ্গে হাড়, দাঁত গঠনে কাজ করে থাকে। কিডনি আমাদের শরীরের ফসফরাসের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণে রাখে বলে কিডনির যে কোন সমস্যায় এই ফসফরাসের পরিমাণ আমাদের শরীরে বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। তাই কিডনি রোগীদের ফসফরাস নিয়ন্ত্রিত খাবার দেওয়া হয়ে থাকে।

বেশি ফসফরাস যুক্ত খাবার	কম ফসফরাসযুক্ত খাবার
কোমল পানীয়, পিনাট বাটার, পনির, গরু/ মুরগীর কলিজা, বাদাম, আইসক্রিম	চাল, আটা, ব্রকলি, ক্যাপসিকাম

পটাশিয়াম

হৃদপিন্ডের জন্য পটাশিয়াম অতি প্রয়োজনীয় একটি খাদ্যপ্রাণ। কিন্তু কিডনি রোগীদের পটাশিয়ামের পরিমাণ শরীরে বৃদ্ধি পায় বলে পটাশিয়াম নিয়ন্ত্রিত খাবারের প্রয়োজন হয়।

বেশি পটাশিয়াম যুক্ত খাবার	কম পটাশিয়াম যুক্ত খাবার
গরুর মাংস, ফলের রস, শুকনা ফল, কলা, কমলা, ডাবের পানি, বাদাম	আপেল, নাসপাতি, আনারস, পেঁপে, চাল আটা

কিডনি রোগীর খাদ্য তালিকা

যেসব খাদ্য গ্রহণ করা যাবে না	যেসব খাদ্য গ্রহণ করা যাবে
লবণ, লবণযুক্ত খাবার, চিপস, আচার, কাঁচা সবজি, সালাদ, পালংশাক, পাটশাক, পুঁইশাক, মুলাশাক, কলমিশাক, বাঁধাকপি, ফুলকপি, ঢেঁড়শ, টমেটো, সজনে, ডাল, ডাবের পানি, ফলের রস, কোমল পানীয়, হরলিক্স, মালটোভা, কফি, কেক, প্যাস্ট্রি, বাদাম, খেজুর, কিসমিস, গরু/খাসির মাংস, কলিজা, ডিমের কুসুম, গলদা চিংড়ি, মাছের ডিম, হাঁসের মাংস, শুটকি মাছ, ধূমপান, তামাক, পান, জর্দা, গুল, অ্যালকোহল ইত্যাদি	সকল খাবারে সামান্য লবণ, সিদ্ধ সবজি, লাউ, চিচিংগা, ঝিংগা, করল্লা, শশা, চাল কুমড়া, বেগুন, পেয়ারা, আপেল, নাশপাতি, আনারস, পেঁপে, কুসুমবিহীন ডিম, মাছ, মুরগীর মাংস (চামড়া বাদে), সূর্যমূখী বীজের তেল, সয়াবিন তেল ননিবিহীন দুধ ইত্যাদি

সোডিয়াম
আমাদের শরীরের পানির ভারসাম্য রক্ষায় সোডিয়াম খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সুস্থ কিডনি অতিরিক্ত সোডিয়াম শরীর থেকে বের করে দেয় কিন্তু কিডনির কোন সমস্যায় কিডনি তা পারে না বলে সোডিয়াম নিয়ন্ত্রিত খাবার দেওয়া হয়ে থাকে।

উচ্চ সোডিয়ামযুক্ত খাবার
খাবার লবণ, আলুর চিপস, সলটেড বিস্কুট, পনির, বাদাম, টিনজাত খাবার, আচার, ফাস্ট ফুড।

পানি ও পানীয়
কিডনি আমাদের শরীরের পানির পরিমাণ ঠিক রাখে। কিডনির সমস্যায় কিডনি পানির ভারসাম্য রক্ষা করতে পারে না বলে কিডনি রোগীদের জন্য পানি বা পানীয় জাতীয় খাদ্য নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়োজন হয়।
পানি ও পানীয় জাতীয় খাদ্য হলো-
চা বা কফি, স্যুপ, আইসক্রিম, দুধ ও পানি।

শর্করা
ক্যালরির প্রধান উৎস হল শর্করা। তবে অতিরিক্ত ওজন বা ডায়াবেটিস থাকলে শর্করা নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন হয়।

ফ্যাট
ফ্যাট ক্যালরির জন্য ভাল উৎস। তবে ফ্যাটের জন্য Unsaturated Fatty acid যেমনঃ সয়াবিন তেল, অলিভ অয়েল ইত্যাদি ব্যবহার করা উচিত। কারণ এই সমস্ত ফ্যাট রক্তের কোলেস্টেরলের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণে রাখে।

আয়রণ ও ক্যালসিয়াম
বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় কিডনি রোগীরা রক্তস্বল্পতা বা হাড়ের সমস্যায় ভুগে থাকে। সেই জন্য কিডনি রোগীদের খাবারে আয়রণ ও ক্যালসিয়াম যোগ করার প্রয়োজন হয়ে থাকে।

কিডনি ভাল রাখার জন্য
কিডনি আমাদের শরীরের ছাকনির কাজ করে। ৩০-৪০ বছর বয়সের পর থেকে কিডনির কাজ করার ক্ষমতা হ্রাস পেতে থাকে প্রায় ১০%। সেই জন্য কিছু সাধারণ নিয়ম মেনে চললে কিডনিকে ভালো রাখা যেতে পারে।

- ডায়াবেটিস, উচ্চরক্ত চাপ এবং হৃদরোগ নিয়ন্ত্রনে রাখা।
- খাবারে সামান্য লবণ ও কাঁচা লবণ সম্পূর্ণ বর্জন করা।
- বেশি পরিমাণে পানি (৮-১০ গ্লাস দিনে) পান করা।
- খাদ্যাভাস পরিবর্তন করা।
- স্বাস্থ্যকর পানীয় (ফলের রস, ডাবের পানি) পান করা।
- অ্যালকোহল ও ধূমপান বর্জন করা।
- সাধারণ শরীরচর্চা এবং প্রতিদিন ৩০-৪৫ মিনিট হাঁটা।
- ডাক্তারের পরামর্শ ব্যতিত ওষুধ সেবন না করা।
- নিয়ন্ত্রিত জীবন, খাদ্যাভাস পরিবর্তন, অতিরিক্ত ওজন কমানোর মাধ্যমে আমরা আমাদের কিডনিকে ভালো রেখে সুস্থ থাকতে পারি।

যোগাযোগ
ল্যাবএইড ডায়াগনস্টিক, রংপুর।
বাড়ি # ৬৯, রোড # ১, ধাপ জেল রোড, রংপুর।
ওয়েব : www.labaidgroup.com

ল্যাবএইড ডায়াগনস্টিক, রংপুর

হটলাইন | **০১৭৬৬৬৬৩০৯৯**

ঝুঁকিপূর্ণ রোগগুলোর মধ্যে হৃদরোগ, উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস ইত্যাদি তেমন কোনো উপসর্গ বা লক্ষণ ছাড়াই দেহের অভ্যন্তরে বেড়ে ওঠে, যা আপনার দৈনন্দিন জীবনকে বাধাগ্রস্থ করে এমনকি ঠেলে দিতে পারে অকাল মৃত্যুর দিকে! তাই প্রতিটি স্বাস্থ্য সচেতন মানুষের উচিত নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার মাধ্যমে নিজের সুস্থতা নিশ্চিত করা। সুস্থ থাকলেও বছরে অন্তত একবার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা জরুরি। আর এ কারণে আপনার স্বাস্থ্য সুরক্ষায় 'ল্যাবএইড ডায়াগনস্টিক, এখন রংপুরে'

বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকবৃন্দ

হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ

- **অধ্যাপক ডাঃ নওয়াজেস ফরিদ**
  প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান (কার্ডিওলজি)
  রংপুর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, রংপুর

মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ও ডায়াবেটোলজিস্ট

- **ডাঃ মোঃ কামরুজ্জামান সরকার**
  এমবিবিএস, এফসিপিএস (মেডিসিন)

মেডিসিন, আর্থ্রাইটিস ও কিডনি বিশেষজ্ঞ

- **ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ডাঃ মামুন মোস্তাফী**
  এমবিবিএস, এমআরএসিপি (অস্ট্রেলিয়া), এমএসিপি (ইউএসএ)
  এফসিপিএস, এফআরসিপি, নেফ্রোলজি ওজেটি (ভারত)
  এ্যাডভান্স নেফ্রোলজি (মালয়েশিয়া ও সৌদি আরব)

মেডিসিন, পরিপাকতন্ত্র ও লিভার বিশেষজ্ঞ

- **ডাঃ মোঃ নওশাদ আলী**
  এমবিবিএস (ডিএমসি), এফসিপিএস (মেডিসিন)
  এমডি (গ্যাস্ট্রোএনটেরোলজি)

হৃদরোগ ও মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

- **ডাঃ হরিপদ সরকার**
  এমবিবিএস, এমডি (কার্ডিওলজি)

মেডিসিন, এ্যাজমা, যক্ষা ও বক্ষব্যাধি বিশেষজ্ঞ

- **ডাঃ তাপস বোস**
  এমবিবিএস, এমসিপিএস (মেডিসিন)
  এমডি (চেস্ট ডিজিজেস), এফসিসিপি (আমেরিকা)

ব্রেইন, নার্ভ, মেরুদন্ড ও স্ট্রোক রোগ বিশেষজ্ঞ ও সার্জন

- **ডাঃ মোঃ তোফায়েল হোসেন ভূঁঞা**
  এমবিবিএস, এমএস (নিউরোসার্জারী)

নাক, কান, গলা বিশেষজ্ঞ ও সার্জন

- **ডাঃ এ. এম. আল-রব্বানী**
  এমবিবিএস, এমএস (ইএনটি)
  নাক, কান, গলা এবং হেড-নেক বিশেষজ্ঞ ও সার্জন

শিশুরোগ ও শিশু হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ

- **লেঃ কর্ণেল ডাঃ মোঃ ফেরদৌসুর রহমান**
  এমবিবিএস, ডিসিএইচ (ডিইউ), এফসিপিএস (পেডিয়াট্রিক্স)
  ফেলো পেডিয়াট্রিক কার্ডিওলজি (এনএইচআইএমএস) ব্যাঙ্গালোর, ইন্ডিয়া

চর্ম, যৌন ও ডায়াবেটিস বিশেষজ্ঞ

- **লেঃ কর্ণেল (ডাঃ) মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন**
  এমবিবিএস, ডিডিভি (ডিইউ), এমসিপিএস
  সিসিডি (বারডেম), এফসিপিএস (ডার্মাটোলজি)
  ফেলোশীপ ইন কিনিক্যাল ডার্মাটোলজি (পাকিস্তান)

জেনারেল, ল্যাপারোস্কপিক ও কলোরেক্টাল বিশেষজ্ঞ

- **ডাঃ মোঃ আনোয়ার হোসেন**
  এমবিবিএস, এফসিপিএস (সার্জারি), এমআরসিএস
  জেনারেল, ল্যাপারোস্কপিক ও কলোরেক্টাল সার্জন

মূত্রতন্ত্র, বন্ধ্যাত্ব এবং পুরুষ যৌনাঙ্গ বিশেষজ্ঞ ও সার্জন

- **ডাঃ মোঃ আনোয়ার হোসেন (মানিক)**
  এমবিবিএস, এমএস (ইউরোলজি)

নবজাতক, শিশু ও কিশোর সার্জারি বিশেষজ্ঞ

- **ডাঃ বাবলু কুমার সাহা**
  এমবিবিএস, এমএস (শিশু সার্জারি)

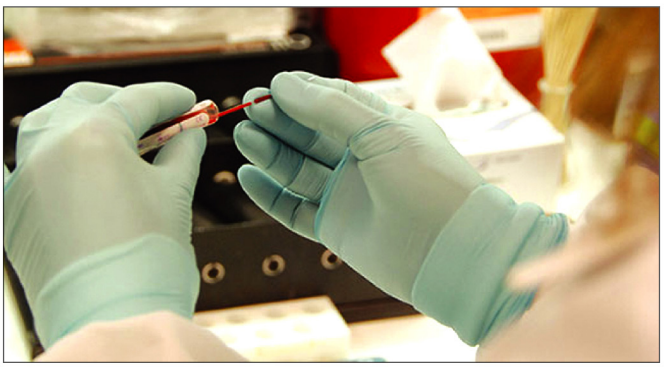

বাত, ব্যথা ও প্যারালাইসিস (রিহ্যাব) বিশেষজ্ঞ

- **ডাঃ মোঃ হাবিবুর রহমান**
  এমবিবিএস, এফসিপিএস (ফিজিক্যাল মেডিসিন এন্ড রিহ্যাবিলিটেশন)

হাড় জোড়া এন্ড স্পাইন রোগ বিশেষজ্ঞ

- **ডাঃ মোঃ জাহিদুল ইসলাম**
  এমবিবিএস, এমএস (অর্থো), এ ও ট্রমা প্রিন্সিপাল কোর্স, ঢাকা
  ফেলো ইন স্পাইন সার্জারি (থাইল্যান্ড)

নিউরোলজি ও মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

- **ডাঃ খন্দকার আতাউর রহমান**
  এমবিবিএস, এমডি (নিউরোলজি)

- **ডাঃ আসফাক আহম্মেদ**
  এমবিবিএস, বিসিএস (স্বাস্থ্য), এফসিপিএস (মেডিসিন)
  এমডি (নিউরোলজি), কনসালটেন্ট (নিউরো মেডিসিন)
  কনসালটেন্ট নিউরোলজি বিভাগ

চক্ষু বিশেষজ্ঞ ও সার্জন

- **ডাঃ মারিয়া আখতার**
  এমবিবিএস, এফসিপিএস (চক্ষু)

ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ

- **ডাঃ আরমান রেজা চৌধুরী**
  এমবিবিএস, এফসিপিএস (রেডিওথেরাপি)
  অনকোলজি বিভাগ

কুষ্ঠ, চর্ম ও যৌন রোগ বিশেষজ্ঞ

- **ডাঃ মোঃ লুৎফর রহমান**
  এমবিবিএস, এমডি (ডার্মাটোলজি ও ভেনেরিওলজি)
  কনসালটেন্ট (চর্ম ও যৌন রোগ)

[HOTLINE : 10606]

শুধুমাত্র সময়মত সঠিক চিকিৎসাই শতকরা ৯৫ ভাগ মারাত্মক অসুস্থ রোগীকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে পারে। তাই হঠাৎ অসুস্থতায় বা দূর্ঘটনায় ঝুঁকি না নিয়ে রোগীকে সরাসরি নিয়ে আসুন আমাদের হাসপাতালে অথবা ফোন করুন অ্যাম্বুলেন্সের জন্য। আমাদের ভ্রাম্যমান আইসিইউ ও সিসিইউ সম্বলিত অ্যাম্বুলেন্স রোগীর কাছে পৌঁছানো মানে তখন থেকেই রোগীর পরিপূর্ণ চিকিৎসা শুরু।

ল্যাবএইড জরুরি বিভাগের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক, দক্ষ নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীরা সব ধরণের জরুরি চিকিৎসাসেবা দিতে প্রস্তুত ২৪ ঘন্টা।

যেসব কারণে জরুরি চিকিৎসা প্রয়োজন-

- বুকে ব্যথা / শ্বাসকষ্ট / স্ট্রোক
- মাথা ঘুরে পড়ে যাওয়া / অজ্ঞান হয়ে যাওয়া / খিচুনি হওয়া
- যে কোনো এক্সিডেন্ট যেমন, হেড ইনজুরি, হাড় ভাঙ্গা ইত্যাদি
- পুড়ে যাওয়া
- প্রস্রাব বন্ধ হয়ে যাওয়া
- জরুরি ডেলিভারি
- অ্যাজমা রোগীদের হঠাৎ শ্বাসকষ্ট শুরু হওয়া
- চোখে, কানে, নাকে, গলায় কিছু আটকে গেলে
- কিডনি রোগীর ২৪ ঘন্টা ডায়ালাইসিস
- শিশুদের জরুরি চিকিৎসা

২৪ ঘণ্টা

জরুরি চিকিৎসা বিভাগ

....ভ্রাম্যমান হাসপাতাল যখন আপনার দরজায়

ল্যাবএইড ইমার্জেন্সি : ০১৭১৩৩৩৩৩৩৭, ০১৭১৬৬৬৬৩২২, ৯৬৬৭০২৬

সাশ্রয়ী মূল্যে সর্বোৎকৃষ্ট জরুরি সেবা

ল্যাবএইড স্পেশালাইজড হাসপাতাল

LABAID SPECIALIZED HOSPITAL
Care First...

বাড়ি ৬, রোড ৪, ধানমন্ডি, ঢাকা ১২০৫ ফোন : ৯৬৭৬৩৫৬, ০১৭১৩০৯১৯৪০, ফ্যাক্স : ৮৮-০২-৯৬১৫৪৯৭, ই-মেইল : info@labaidgroup.com, ওয়েব : www.labaidgroup.com